Code no 4.8
SL 45
Mss / 2n the Press
892

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

মনিবাগচি

মনিবাগচি

ছোটদের
বইয়ের
স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের নতুন ঠিকানা
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

ACC NO - 15044

দেশবন্ধু : ২.

৪'৮

৪৭২

স্মরণীয় বরণীয় - ১১

দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন

অনি ঘোষ

ঈশ্বর পুস্তকালয়
৮/১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে
যথার্থভাবে প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে
সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহা
কোনও বিশেষ রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কর্তব্য
পালনের আদর্শমাত্র নহে, তাহা সেই সৃষ্টিশক্তিশালী
মহাপ্রাণতা যাহা তাঁহার জীবন মরণের মধ্যে
অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।

— রবীন্দ্রনাথ।

দেশপ্রেমের উজ্জ্বল বিগ্রহমূর্তি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

তিনি সর্বত্যাগী হয়েছিলেন শুধু দেশপ্রেমের জন্য। পরাধীন দেশের জন্য তাঁর ভালবাসা, দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর অদম্য প্রয়াস—এইসব গুণের জন্যই তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে দেবতার আসন পেতে বসেছিলেন। দেশের পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে একেবারে পাগল করে তুলেছিল। তাইতো তাঁর মধ্যে ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রকাশ। তাঁর কাছে দেশের স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র সত্য—সেই লক্ষ্য থেকে চিত্তরঞ্জন একটুকু বিচলিত হননি। তিনি ছিলেন শতযুদ্ধের বিজয়ী বীর।

এই মহিমময় জীবনের কথা আজ তোমাদের শোনালাম। বড় হয়ে তোমরা ভারতের এই শ্রেষ্ঠ মহানায়কের কথা আরো ভালো করে জানবে।

মণি বাগচি

॥ শুরু ॥

— চিত্ত, বড়ো হলে তুমি কি হবে?

— আর যাই হই না কেন, উকিল আমি হব না, জ্যাঠামশাই।

— কেন?

— আমার ধারণা উকিলেরা সব জুয়াচোর হয়।

— তাহলে তোমার বড়ো কাকা, আমি, তোমার বাবা সব জুয়াচোর?

— আপনারা কি করেন জানি না, কিন্তু আইনের ব্যবসায় পসার করতে হলে জুয়াচুরি ছাড়া উপায় নেই।

— এ তোমার মিথ্যা ধারণা, চিত্ত।

একদিন আলীপুরে বিখ্যাত দাশ পরিবারের দুর্গামোহন দাশের সঙ্গে তাঁর এক ভাইপোর এই রকম কথাবার্তা হচ্ছিল। এই ভাইপোটির নাম চিত্তরঞ্জন দাশ। যিনি উকিল হতে আপত্তি করেছিলেন এবং বলেছিলেন, উকিলেরা সব জুয়াচোর হয়, [redacted] সেই চিত্তরঞ্জনই ওকালতি ব্যবসা গ্রহণ করে, তাঁর সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ইনিই পরে দেশবন্ধু রূপে সারা দেশে পূজিত হয়েছিলেন।

বংশকথা

তিন ভাই — কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন দাশ। তিন জনেই হাইকোর্টে ওকালতি করতেন।

বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রাম। ঢাকা জেলার (এখন প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের অন্তর্গত) মধ্যে বিক্রমপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সেই বিক্রমপুরের মধ্যে তেলিরবাগ গ্রামের দাশ-পরিবার খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে খুব বড়ো ছিলো। শুধু খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে নয়, সমাজসেবা, পরোপকারিতা ও দানশীলতার তেলিরবাগের বৈদ্যরা এক সময়ে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। গ্রামটি খুবই প্রাচীন, আর এই গ্রামের যা-কিছু নাম-ডাক তা ছিল এঁদেরই জন্য।

তেলিরবাগের এই দাশ-পরিবারটি যেন উকিল-ব্যারিস্টারদেরই বংশ। একটি পরিবারের মধ্যে এতগুলি আইনজীবী মানুষের কথা চিন্তা করে হঠাৎ ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়। কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন—তিন ভাই যেন হরিহরাত্মা। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কালীমোহন ছিলেন এই বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান। যৌবনকালেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ওঁরা বরিশালে ওকালতি আরম্ভ করেন এবং পরে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

যে বছর দুর্গামোহন বরিশাল থেকে কলকাতায় ওকালতি করতে এলেন সেই বছরেই (১৮৭০ সাল) [redacted] উত্তর কলকাতার পটলডাঙায় চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তিনজনেই তখন একসঙ্গে পটুয়াটোলা লেনে একটা ভাড়াবাড়িতে বাস করতেন। এর অনেক বছর বাদে ওঁরা দক্ষিণ কলকাতায়, ভবানীপুর অঞ্চলে [redacted] চলে যান। সেইখানেই ১৪৮ নম্বর রসা রোডে কালীমোহন তাঁদের নিজস্ব একটি বসতবাড়ি তৈরি করেন। উত্তরকালে এই বাড়ির মালিক হয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। সেই বাড়ি এখন 'চিত্তরঞ্জন

১ ১৮৭০ সালে আর একজন বিখ্যাত বাঙালী সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার।

সেবাসদন'। এটি [redacted] দেশবন্ধু দেশের কাছে দান করে গিয়েছিলেন, সেইকথা পরে যথাস্থানে বলব।

চিত্তরঞ্জনের বাবা ভুবনমোহন, মা নিস্তারিণী দেবী। পিতামাতার তিনি ছিলেন প্রথম পুত্র সন্তান। ভুবনমোহনের তিন ছেলে — চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন, বসন্তরঞ্জন ও তিন মেয়ে। তাঁর বাবা ও মায়ের কথা পরে বলব; তার আগে তাঁর দুই জ্যাঠামশাই সম্বন্ধে কিছু বলি। কারণ এঁদের চরিত্রগত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অনেকখানি এঁদের অনাগত ভ্রাতুষ্পুত্রটির মধ্যে দেখা গিয়েছিল। চিত্তরঞ্জন সকল দিক দিয়েই তাঁদের বংশের যেমন মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তেমনি তিনি উজ্জ্বল করেছিলেন দেশের মুখ।

১ তেজস্বী ও নির্ভীক। তাঁর বড়ো জ্যাঠামশাই কালীমোহন ছিলেন খুব তেজস্বী প্রকৃতির মানুষ। ১ হাইকোর্টে উকিল হিসাবে তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল। একবার তিনি [redacted] কোন একটা মামলায় একজন আসামীর পক্ষ সমর্থন করে সওয়াল করছিলেন বিচারপতি স্যার লুই জ্যাকসনের এজলাসে দাঁড়িয়ে। জ্যাকসন খুব মেজাজী লোক ছিলেন। যদিও তিনি নির্ভুল ইংরেজিতে সওয়াল করছিলেন, তবু বিচারপতি জ্যাকসন হঠাৎ মন্তব্য করলেন, কালীমোহন বাবু, আপনার ইংরেজি ঠিক হচ্ছে না। জ্যাকসন আর কোনও কথা বললেন। কালীমোহন রেগে গেলেন, কিন্তু সংযত থেকে খুব গম্ভীরভাবে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন, ইংরেজির দিকে নজর না রেখে আমি যে যুক্তি দেখাচ্ছি, তাই লক্ষ্য করুন।

তখন কালীমোহনকে বেয়াদবির দায়ে জেলে দেবার জন্য বিচারপতি-

তাঁকে খুঁটিনাটি একটা প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। কালীমোহনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি তখনি জজসাহেবের মুখের উপর বললেন, "হুজুর, আমি খুবই বিস্মিত হচ্ছি যে, যদিও জেলার জজ হিসাবে আপনি অনেক বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তবু আইনের একটা ছোট ছেলে যা বুঝতে পারে, আপনি সে বুঝতে পারছেন না।" হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে দাঁড়িয়ে সম্মানের মধ্যে। এমন কথা বলার যে শক্তি ও সাহসের দরকার তা তেজস্বিতার দিক কালীমোহনের ছিল। ন্যায়ধর্মবোধের এই যত্ন, এই নির্ভীকতা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল।

কালীমোহনের মেজছেলে দুর্গামোহন। ইনিও আত্মসম্মানে সচেতন ও খুব সাহসী ছিলেন। তাঁর সময়ে ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান নামকরা নেতা ছিলেন ও সমাজের সকলরকম সংস্কার আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই রসা রোডের বাড়িটা সকল রকম সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেমন ১৯২০ সাল থেকে, অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনের সময় থেকে ঐ বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান দুর্গ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান নেতা হিসাবে সমাজের সকলরকম উন্নতির ব্যাপারে দুর্গামোহন মুক্তহস্তে টাকা খরচ করতেন। তিনি খুব বেশী দৃঢ়চেতা ছিলেন। যে-কথাটি উচিত মনে করতেন সেই কথা থেকে তিনি পিছু হটতেন না এবং কারো তিনি কারো কথা বা বিরোধিতা মানতেন না। জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও এই গুণটি দেখা যেত। তিনিও কোন একটা কথা বললে সেটা শেষ না করে ছাড়তেন না। এটাই যেন ছিল এই পরিবারের প্রকৃতি।

ভুবনমোহন ছিলেন ভাইদের মধ্যে কনিষ্ঠ। পটল ডাঙার বাড়িতে তিন ভাই যেমন একসঙ্গে থাকতেন, রসা রোডের বাড়িতে এসেও তাঁরা ঠিক সেই ভাবে থাকতেন — তিন ভাইয়ের হাঁড়ি কখনো আলাদা হয়নি। তিন ভাইয়ের মধ্যে এই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি দেখবার জিনিস ছিল। একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শটি এঁরা খুব মানতেন। চিত্তরঞ্জনও এই ধারা মেনে চলেছিলেন তাঁর জীবনে। হাইকোর্টে এটর্নি হিসাবে ভুবনমোহন যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ইংরেজ বিচারপতিদের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। পিতার এই গুণ তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল।

ভুবনমোহন অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষাও পাশ করেছিলেন। আইনে তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল এবং মকদ্দমার আইনগত সারবস্তুর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র চিত্তরঞ্জন তাঁর পিতার এই প্রতিভা পেয়ে থাকবেন। আইন-ব্যবসায়ে ভুবনমোহন প্রচুর উপায় করেছিলেন। কিন্তু বলতে হবে কি, দাশ-পরিবারের দানশীলতা ও ঔদার্য তাঁর মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। পরের দুঃখ দেখলে ভুবনমোহন স্থির থাকতে পারতেন না। পিতার এই প্রীতি চিত্তরঞ্জন বিশেষভাবে লাভ করেছিলেন। ইনিও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধানদের মধ্যে একজন ছিলেন

ভুবনমোহনের চরিত্রে অনেক সদ্গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি যত বড় উকিল ছিলেন তার চেয়ে বেশি সংস্কৃতিবান ছিলেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি সুশিক্ষিত। শিক্ষার সঙ্গে মিশেছিল সংস্কৃতির প্রতি তীব্র অনুরাগ। পিতার এই মানসিকতা পুত্র চিত্তরঞ্জনের

প্রতীত দেখা গিয়েছিল। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আর ধর্মে গভীর অনুরাগ ভুবনমোহনকে সকলের শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে কোনদিন দেখা যায় নি। স্বজনবৎসল ভুবনমোহন সবসময় আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে থাকতেন — দুরবস্থার সময়েও কোন গোষ্ঠীকে তিনি ত্যাগ করেননি। মিষ্টভাষিতা, সদালাপ ও অমায়িক ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সজ্জন। দান ও পরোপকারে মানুষটি ছিলেন মুক্তহস্ত এবং এজন্য তাঁকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল। লোককে তিনি টাকা ধার দিতেন, কিন্তু ওসব টাকা আদায় করতে পারতেন না। এই উদারতা তাঁকে পথে বসিয়েছিল। শেষজীবনে দেনার দায়ে বিব্রত হয়ে তাঁকে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

অনেক টাকা উপায় করা সত্ত্বেও ভুবনমোহনকে দেউলিয়া আদালতে যেতে হয়েছিল কেন? প্রথম কথা, মানুষটি সঞ্চয়ী ছিলেন না; দ্বিতীয় কথা, বন্ধুপ্রীতি। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল আড়ম্বরহীন; বিলাসিতার ধার দিয়েও তিনি কখনো যেতেন না। তাঁর এক বন্ধুর উপকার করতে গিয়েই তাঁকে পথে বসতে হয়েছিল। এক বন্ধুর জামিন হয়ে সেই দায়ে ভুবনমোহনকে চল্লিশ হাজার টাকার দেনা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। অগ্রজ দুর্গামোহন ওঁকে ঋণমুক্ত করার জন্য অনেক সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু চল্লিশ হাজার টাকা পরিশোধ করা তাঁর ক্ষমতার বাইরে ছিল। দেউলিয়া হয়ে ভুবনমোহন আইনের চোখে ঋণমুক্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে ঋণী, এটা সবসময় অনুভব করতেন। দাশ-পরিবারের মর্যাদাও এতে কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন পিতৃঋণ শুধে তাঁর বাবাকে ঋণমুক্ত করেছিলেন। সে কাহিনী পরে বলব।

এইবার চিত্তরঞ্জনের মায়ের কথা বলি। তাঁর জীবনে নিস্তারিণী দেবীর প্রভাব বড়ো কম ছিল না। দাশ-পরিবারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী। তাঁর মধ্যে নারীসুলভ আচরণ খুব সহজেই দেখা যেত। সংসারে সকলকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। স্বামীর মতো তিনিও দানশীলা ছিলেন। তাঁর বদান্যতা শুধু আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, আর্ত ও অভাবগ্রস্তের প্রতিও তা ছিল নিত্য প্রসারিত। এছাড়া একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের গৃহিণী হওয়ার সকল গুণই তাঁর ছিল। দুর্গামোহনের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবীর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলেমেয়েরা নিস্তারিণী দেবীর কাছে নিজেদের কখনো মাতৃ-হারা মনে করতে পারেনি।

আকাশের মতো উদার ছিল নিস্তারিণী দেবীর হৃদয়। এই গুণের সবটাই পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম সন্তান চিত্তরঞ্জন। খুব যে একজন শিক্ষিতা মহিলা তিনি ছিলেন তা নয়, তবে স্বামীর সাহচর্যে তিনি নিজেকে সকল দিক দিয়ে দাশ-পরিবারের উপযুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি তাঁর ছিল খুব প্রখর। স্বামী-পুত্র-পরিবারের সেবায় তাঁর জীবন সার্থক হয়েছিল। স্বামী যখন দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন, তখন নিস্তারিণী দেবী যে ধৈর্য ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ভুবনমোহনের দুশ্চিন্তার ভার লাঘব করেছিলেন তা দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। এমন মায়ের প্রতি চিত্তরঞ্জন যে গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করবেন, এটা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

॥ দুই ॥

১৮৭০, ৫ই নভেম্বর। শনিবার।

এই দিনটিতে পটলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন চিত্তরঞ্জন। পিতামাতার তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র। ভাই-বোন মিলে তাঁরা সবশুদ্ধ আটজন। তিন ভাই, পাঁচ বোন। চিত্তরঞ্জন যখন স্কুলে ভর্তি হন, তখন তাঁর বাবা-মা পটলডাঙা থেকে উঠে গিয়ে তাঁদের নতুন বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করেন। যেখানে তাঁদের বাড়ি সেই জায়গার নাম ছিল বেলতলা। এই বেলতলায় ভুবনমোহন দাশই প্রথমে বসতি স্থাপন করেন। দাশ-পরিবারই ছিলেন এই অঞ্চলের প্রথম অধিবাসী।

চিত্তরঞ্জনের লেখাপড়া শুরু হয় লন্ডন মিশনারি স্কুলে। স্কুলটা তাঁদের বাড়ির কাছেই ছিল। এটা ছিল মিশনারিদের স্কুল। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন চিত্তরঞ্জন এখানে ভর্তি হন। আট বছর তিনি এখানে পড়েছিলেন। লেখাপড়ায় তিনি যে খুব ভালো ছিলেন তা নয়; তাই বলে যে মন্দ ছিলেন তাও নয়। লেখাপড়ায় যতখানি না মন ছিল, তার চেয়ে বেশি মন ছিল দলবাঁধার দিকে। স্কুলের সহপাঠী ও স্কুল-বন্ধুদের নিয়ে বালক চিত্তরঞ্জন দল বাঁধতেন। এ বিষয়ে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। উত্তরকালে যখন তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তখন তাঁর স্বরাজ্য দল গঠনে এই ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে দেশবাসী বিস্মিত হয়েছিল। সে-কথা পরে বলব।

ছাত্রজীবনে স্কুলে সকলকেই চিত্তরঞ্জন তাঁর মতে ও পথে আনতে পারতেন। কোনদিন কারো সঙ্গে কলহ করে মনোমালিন্য করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত নেই, বরং

এমন ঘটেছে যেখানে অন্য বন্ধুদের মধ্যে মনোমালিন্য হলে তিনি তাদের আত্মসম্মানে উপস্থিত থেকে তার মীমাংসা করে মিটমাট করে দিলেন। এই ছিল তাঁর প্রকৃতি। বাড়ি থেকে স্কুলে চিত্তরঞ্জনের জন্য টিফিন আসত, কিন্তু তিনি তা একলা খেতেন না খেতেন, অন্য বন্ধুদের দিতেন। এমন অনেক দিন গিয়েছে যে, বাড়ি থেকে কি টিফিন দেওয়া হয়েছে তা না দেখেই তিনি বন্ধুদের মুখে তুলে দিয়ে দেখেছেন যে নিজের জন্য অবশিষ্ট কিছুই নেই। উত্তরকালে যিনি দাতাকর্ণের মতোই দাতা হয়েছিলেন, ছেলেবেলাতেই তার আভাস তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

তাঁর স্কুল-জীবনে প্রথম প্রাইভেট টিউটর ছিলেন লন্ডন মিশনারি স্কুলের শিক্ষক কালীহরি সেন। পরে তিনি যখন ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়েন, তখন পূর্ণ হালদার তাঁর গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। পূর্ণবাবুকে তিনি খুব ভালবেসেছিলেন এবং দরকারের সময় তাঁকে সাহায্য করে ধন্য হয়েছিলেন। হালদার মশাইকে তিনি কয়েক হাজার টাকা খরচ করে একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। ছাত্র-জীবনে চিত্তরঞ্জন যে দল বাঁধতে ভালবাসতেন তা নয়, কবিতা লিখতেও আনন্দ পেতেন। স্কুলে তিনি সহপাঠীদের নিয়ে একটি সাহিত্য সভা স্থাপন করেছিলেন। [illegible] [redacted] এই [illegible] সভায় তাঁর অংশই ছিল উল্লেখযোগ্য। নিজে কবিতা লিখতেন, বন্ধুদেরও কবিতা [illegible] লিখবার জন্য উৎসাহিত করতেন। বেশিরভাগ দিনই চিত্তরঞ্জন নিজের লেখা কবিতা পড়তেন। যেদিন কোন তথ্যনিষ্ঠ লেখা হয়ে উঠত না, সেদিন অন্যান্য কবিদের

লেখা থেকে আবৃত্তি করতেন; দেশাত্মবোধক কবিতাই বেশিরভাগ আবৃত্তি করতেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। হেমচন্দ্রের ভারত-সংগীত কবিতাটি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, রঙ্গলালের অনেক কবিতাও তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। তিনি যখন উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন:

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।

শুনে তাঁর সহপাঠীরা মুগ্ধ হয়ে যেত। তেমনি স্কুলে পড়বার সময়েই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। দেশপ্রেমের যে মন্ত্রে তিনি কিশোর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন সেই বীজ-মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। স্কুলে থাকতে তিনি অঙ্ক আর বিজ্ঞানে যতটা না পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন, তারচেয়ে অনেক বেশি অনুরাগ দেখাতেন সাহিত্যে। উত্তরকালে চিত্তরঞ্জন যে প্রথম কবি ও সাহিত্যিক হবেন তার আভাস তিনি তাঁর স্কুলজীবনেই দিয়েছিলেন।

১৮৮৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে, চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। এটাই ছিল শহরের সেরা কলেজ – সরকারী কলেজ। বড় ঘরের ছেলেরাই এখানে পড়তো। হিসেবমতো তিনি ষোল বছর বয়সে কলেজের ছাত্ররূপে প্রবেশ করেন। স্কুলে যেমন, কলেজেও তেমনি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর প্রাণের প্রাচুর্য ও মনীষা তাঁকে সহপাঠীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুললো। চিত্তরঞ্জনের সহপাঠের

এই যে শরীরবল আর আকর্ষণী শক্তি, এ দুটোই যেন ছিল তাঁর সহজাত। তিনি যখন এই কলেজে পড়তে আসেন তখন এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর পি. কে. রায় — তাঁরই ভগ্নীপতি। ডক্টর রায় দুর্গামোহনের জামাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে চিত্তরঞ্জন সবসুদ্ধ চার বছর পড়েছিলেন। ১৮৯০ সালে তিনি এখান থেকেই বি. এ. পাশ করেন।

যেমন স্কুলে তেমনি কলেজে পড়ার সময়ও পড়ার বই যতনা পড়তেন তার চেয়ে ঢের বেশি অন্য বই — সাহিত্যের বই — পড়তেন। বাংলা ও ইংরেজি দুই-ই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, অন্যদিকে ইংরেজ লেখকদের মধ্যে কীট্‌স, শেলি ও সুইনবার্ন। সুইনবার্ন তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন। পড়ার নেশা ছাড়াও স্কুলের সাহিত্যসভার মতো কলেজেও তিনি ছাত্র সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। অ্যালবার্ট হলে (তখনকার নাম কফি হাউস) এই সমিতির অধিবেশন হতো। দেশবিখ্যাত বাগ্মী ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। কলেজের বিতর্কসভায় চিত্তরঞ্জনের খুব নাম ছিল। ইংরেজিতে [redacted] খুব সেই বয়সেই তিনি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন আর বক্তৃতাও ভালো করতে পারতেন। তাঁর সময়ে সেকালের বক্তা বলতে ছিলেন দুজন — সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল। উত্তরকালে বিপিনচন্দ্রের কাছেই তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র তখন তাঁর বাবার বন্ধুও ছিলেন।

॥ ৪ ॥

বি.এ. পাশ করার অল্প কয়েক মাস পরেই চিত্তরঞ্জন গেলেন বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে। তাঁর বাবার খুব ইচ্ছা ছিল চিত্তরঞ্জন এই পরীক্ষা দেন।

কারণ কৃতকার্য হতে পারলেই উঁচু মাইনের একটা চাকরি সুনিশ্চিত। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগতভাবে দুর্গামোহনের ইচ্ছা ছিল চিত্ত ব্যারিস্টারি পড়েন। আসল কথা তাঁর সময়ে আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না; ব্যারিস্টারিতে কৃতকার্য হলেও মনে হচ্ছে যে পসার জমবে তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই চিন্তা করেই ভুবনমোহন ছেলেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্যই বিলাত পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। সিভিলিয়ান হতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন ফিরে এলেন ব্যারিস্টার হয়ে। তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেননি। কেন? পড়াশুনায় অমনোযোগিতা এর একমাত্র কারণ ছিল না। এর কারণ ছিল রাজনীতি। লন্ডনে এসে অবধি চিত্তরঞ্জন লেখা-পড়ার চেয়ে রাজনীতির চর্চা করেছিলেন একটু বেশি আগ্রহে। অকৃতকার্য হওয়ার পর তিনি আইন পড়তে থাকেন। ছেলের অকৃতকার্যতার সংবাদে মর্মাহত হলেও ভুবনমোহন তাঁকে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিত্তরঞ্জন ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরে আসেন ও কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিলাতের সেই ছাত্রজীবনের দিনগুলিতে চিত্তরঞ্জন বিভিন্ন সময়ে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যেই তাঁর স্বদেশপ্রেম ও আত্মসম্মানবোধ ফুটে উঠেছিল। আরো একটা কথা। তিনি যখন ব্যারিস্টার হয়ে দেশের মাটিতে ফিরে এলেন, তখন বাড়ির সবাই অবাক হয়ে দেখল যে, যেমন চিত্তরঞ্জন বিলাত গিয়েছিলেন ফিরে এলেন ঠিক

সেই চিত্তরঞ্জন। যেখানে সাহেব সাজতে হয়েছিল তিনি সেখানে তেমন সেজেছিলেন। বাড়ি ফিরে [illegible] গুরুজনদের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েছিলেন। পরলেন বাঙালির পোশাক — ধুতি ও চাদর। মেঝেয় আসন পেতে বসে এক থালায় বোনেদের নিয়ে খেতে লাগলেন। এর থেকেই তোমরা বুঝতে পারো যে বিলাতি পরিবেশ চিত্তরঞ্জনকে মোটেও বদলাতে পারেনি।

অদৃষ্টের লিখন কেউ মুছে ফেলতে পারে না। চিত্তরঞ্জন বিলাত গিয়েছিলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করতে, কিন্তু তাঁর মতো একজন স্বদেশপ্রেমিক যুবক যদি সার্ভিসে আসেন তাহলে তো ভয়ের কথা! তিনি নিজেই একবার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তাঁর মাইনেতে কোন অসুবিধে ছিলনা; চাকরিটা পেলে, অনেক বেশি সুখ হবে। কিন্তু দেশমাতার সেবায় যিনি আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছেন তাঁকে দিয়ে অন্য কাজ কে করাতে পারে? শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনেও ঠিক এমনি ঘটেছিল।

॥ তিন ॥

তেইশ বছর বয়সে হাইকোর্টে ঢুকলেন চিত্তরঞ্জন। শুরু হয় তাঁর গৌরবমণ্ডিত কর্মজীবন। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন ছিল সংগ্রামময়। হাইকোর্টে প্রথম প্রথম তিনি কিছুতেই সুবিধে করতে পারেননি। এর প্রধান কারণ তাঁর তখনকার সামাজিক অবস্থা। দেউলিয়া পিতার পুত্র তিনি, [illegible] তখন ব্যারিস্টার হিসাবে তেমন কদর বা পরিচিতি ছিলনা কিছুই। প্র্যাকটিস নেই একদম। মাসের পর মাস প্রতিদিন ভবানীপুর থেকে হাইকোর্টে আসা আর হাইকোর্ট থেকে দিনের শেষে খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাওয়া — এ যে কি বেদনাদায়ক তা বুঝিয়ে বলার নয়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে আর নিরাশায় ছেয়ে গেছে তাঁদের জীবন।

চিত্তরঞ্জনের অবস্থাও প্রথম প্রথম ঠিক এই রকম ছিল। ভবানীপুর থেকে রোজ হাইকোর্টে আসেন, বার লাইব্রেরিতে বসে সতীর্থদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন অবসর বিকেলে ফিরে যান খালি হাতে। মাঝে বলে ব্রীফলেস ব্যারিস্টার অর্থাৎ মক্কেলহীন উকিল। পয়সার অভাবে অনেক সময় তিনি ময়দানের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতেন। [illegible] তাঁকে পরামর্শ দিল, চিত্ত, হাইকোর্টের আশা ত্যাগ করে, তুমি বরং মফঃস্বলের দিকে তাকাও। সেখানকার কোর্টে কেস পাবে।

এই হলো তখন থেকে তিনি কলকাতার বাইরে [illegible] আসতে যেতে থাকেন। ও মফঃস্বল কোর্টে বেশ ধরে তাঁর কিছু রোজগার হতে লাগল। রোজগার হতে লাগল বটে কিন্তু বাবার দেনা পরিশোধ করার

হলো আয় থেকে দেনা শোধ তাঁর হয়নি। বাবার মৃত্যুর দেনা মাথায় নিয়ে চিত্তরঞ্জন দেনাদারদের কাছে দুখানা দলিল নতুন করে সই করে দিলেন। প্রজন্মবর্তী পরিবার, পরিবারে সৌভাগ্যবান সব ছিলেন — ছোট বড় প্রতিটি শিশুর ভার নিজেকেই বইতে হলো। তার উপর দেনাদারদের তাগাদা। কী কঠিন জীবন-সংগ্রাম! — মাথা পেতে মেনে নিলেন চিত্তরঞ্জন। তাগাদার চোটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে চিত্তরঞ্জন অনেক দুর্ভোগকে নিয়ে দেন হ্যান্ডনোট। কিন্তু দেনা পরিশোধ করতে দেরী হওয়াতে তারা কেস আদায় করতে যায়।

নিরুপায় হয়ে চিত্তরঞ্জন তখন ১৯০৬, সালে হাই কোর্টে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এটা বড় সহজ উপায় ছিল না, নইলে আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন করে এমন কাজ করার মানুষ তিনি ছিলেন না। এজন্য তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। এসময়টা তাঁর জীবনে অগ্নিপরীক্ষার সময় ছিল বললেই হয়। দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নেওয়ার ফলে একদিকে তাঁর সামাজিক মর্যাদার যেমন হানি হয়, অন্যদিকে তেমনি আইনব্যবসায় পসারেরও ক্ষতি হলো। হাইকোর্টে তাঁর অভিজ্ঞতার সমাদর ঠিকমত হলো না।

কিন্তু তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরল ১৯০৭ সাল থেকে। বন্দে মাতরম্ নামে তখনকার ইংরেজি কাগজ ছিল। অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল হন সম্পাদকীয় লিখতেন। কিছুদিন পরে সরকার দুটি (প্রবন্ধের জন্য) আদালতে মামলা বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ নিয়ে এলেন ও প্রধান সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দ ঘোষ ধৃত হয়ে জামিনে মুক্ত হলেন। তাঁর বিরুদ্ধেও মোকদ্দমা দায়ের করা হলো। সরকার পক্ষ থেকে

বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষী মানা হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে বিপিনচন্দ্র সাক্ষী দিলে অরবিন্দের জেল সুনিশ্চিত। সাজাটাও উঠে যাবে। চিত্তরঞ্জন এই মোকদ্দমায় অরবিন্দের পক্ষে [redacted] দাঁড়ালেন তাঁর কৌঁসুলি হিসাবে। তিনি মামলার বিষয়টি খুব ভালো করে বিবেচনা করলেন। একটা বুদ্ধি তাঁর মাথায় এলো। সরকার যাঁকে প্রধান সাক্ষী মেনেছে তিনি যদি সাক্ষী না দেন তা হলে এ মামলায় কিছুই হবে না অরবিন্দের।

একদিন সকালে চিত্তরঞ্জন গেলেন বিপিনচন্দ্রের কাছে। তাঁকে বললেন, আপনি তো এই মামলায় প্রধান সাক্ষী।

—তাইতো মনে হচ্ছে।

—আপনার [redacted] উপরই এখন অরবিন্দের জেল অথবা [redacted] খালাস নির্ভর করছে।

—আমায় কি করতে হবে?

—সাক্ষী হিসাবে আপনি আদালতে শপথ নেবেন না।

—তাতে যদি আমার জেল হয়?

—তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিয়ে নেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তাই হলো। ১৯০৭, ২৬শে আগস্ট প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের [redacted] এজলাসে বন্দেমাতরমের মামলা উঠলো। চিত্তরঞ্জনের পরামর্শ অনুসারে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপিনচন্দ্র বললেন, এই মোকদ্দমায় সাহায্য করতে ও শপথ

নিতে আমার বিবেক আমাকে নিষেধ করে। আমি সাক্ষী দেবনা' সাক্ষী দেবনা! ইংরেজের আদালতে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলা সেদিন বড়ো কম কথা ছিলনা। তিনি যখন কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে রাজী হলেন না, তখন আদালত অবমাননা করার অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হলেন।

এই সেপ্টেম্বর এই মামলার বিচার আরম্ভ হলো। বিপিনচন্দ্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে সেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁর সওয়ালে বলেছিলেন: 'আমার যথার্থ বিবেচনায় বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে এই মামলা শুধু অন্যায় নয়, অতিশয় বটে — ক্ষতিকর এইজন্য যে, এই মামলার ফলে জনসাধারণের চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে যাবে — এই মামলা জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বিরোধী।'

ভবিষ্যতের নেতা দেশবন্ধুকে যেন আমরা তাঁর এই সুযুক্তিপূর্ণ সওয়ালের মধ্যে দেখতে পাই। বিচারে বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হলো। তিনি সাক্ষ্য না দেওয়াতে পুলিশ প্রমাণ করতে পারলনা যে আপত্তিকর প্রবন্ধগুলির লেখক অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন। প্রসঙ্গত একথা বলা দরকার যে, অরবিন্দকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথ, সেই বিখ্যাত কবিতাটি লিখেছিলেন যার প্রথম লাইনটি হলো: 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

বন্দেমাতরমের মামলায় জয়লাভ করতে না পারলেও, এখন উদীয়মান আইনজীবী হিসাবে চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। তারপরেই তিনি দাঁড়ালেন সন্ধ্যা পত্রিকার মামলায় এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের

পক্ষ সমর্থন করে। কয়েকটি বিদ্রোহমূলক প্রবন্ধের জন্য সরকার সন্ধ্যা কাগজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সম্পাদক ও মুদ্রাকর দুজনেই গ্রেপ্তার হলেন। চিত্তরঞ্জন বিনা পারিশ্রমিকেই তাঁদের পক্ষে মামলা চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বন্দেমাতরমের মামলাতেও তিনি বিনা পারিশ্রমিকে করেছিলেন। তাঁর কৌশলী চিত্তরঞ্জন মামলার জেরায় দিয়েই প্রধান আসামীর নায়ক হিসাবে, আদালতের সামনে যে তথ্য রেখেছিলেন তাতে শ্যামসুন্দর শ্রীঅরবিন্দ ও চক্রে উঠেছিলেন। ভারতে সংবাদের মামলার ইতিহাসে এমন অবশিষ্ট কোন সাক্ষীকে আর কখনো হাজির করা হয়নি।

এর পরেই চিত্তরঞ্জন দাঁড়ালেন 'যুগান্তর' পত্রিকার মামলায় এর সম্পাদকের পক্ষ সমর্থন করে। বিপ্লবী দলের মুখপত্র যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল রাজদ্রোহের অভিযোগ। এখানে বলা দরকার যে, এইসব স্বদেশী মোকদ্দমা থেকে চিত্তরঞ্জনের কোনই রোজগার হত না, বরং এইসব মামলার জন্য তাঁকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হত, খাটতে হত। তাঁর দেশপ্রেমই যে তাঁকে এইসব কাজে অনুপ্রাণিত করতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। এক এক করে ইংরেজ ব্যারিস্টার যেমন রাজদ্রোহের মামলায় সরকার পক্ষে নিযুক্ত হন। এঁদের সকলের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিভা নিয়ে চিত্তরঞ্জন লড়তেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা-বিভূতি, তাঁর স্মৃতিশক্তি নির্ভীক সওয়াল আদালতে সবাইকে মুগ্ধ করতো। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি ব্যারিস্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা পায় করলেন ইতিহাস-বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলায়।

* [illegible]

অরবিন্দ ছিলেন এই মামলার প্রধান আসামী। তাঁর সাথে আরো ত্রিশ-চল্লিশজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। সকলের বিরুদ্ধেই রাজদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল পুলিশ। এখানে এই মামলার সংক্ষেপে পটভূমিটি তুলে ধরছি। ১৯০৫ সালে ইংরেজ সরকার যখন দুই বাংলা ভেঙে টুকরো করল তখন থেকেই বাংলার মাটিতে জন্ম নিল সশস্ত্র বিপ্লব। যার নেতা ছিলেন অরবিন্দ আর সহযোগী ছিলেন তাঁরই ছোট ভাই বারীন্দ্র। সারা দেশে চলতে থাকে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র আর যুদ্ধের আয়োজন। বাংলার যুবক দল — জীবন মরণ যাদের কাছে ছিল তুচ্ছ — সারা বাংলায় জ্বালিয়ে তুলেছিল বিপ্লবের আগুন।

সেই আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল মজঃফরপুরে ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮। ঐদিন রাত্রির অন্ধকারে কিশোর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বোমা নিক্ষেপ করেন। যাকে মনে করে তাঁরা বোমা ছুঁড়েছিলেন সেই অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের বদলে মারা যান দুটি নিরীহ মানুষ — মা ও মেয়ে। স্থানীয় উকিল মিস্টার কেনেডির স্ত্রী মিসেস কেনেডি ও তাঁর মেয়ে। ১লা মে ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন আর প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করে। সাথে সাথে পুলিশের তোড়জোড় শুরু হয় সারা বাংলায়, বিশেষ করে মানিকতলার কাছে মুরারীপুকুর বাগানে। এখানেই ছিল বিপ্লবীদের প্রধান শিবির। ধরা পড়লেন অরবিন্দ, তাঁর ছোট বারীন্দ্র ও আরো অনেকে।

আসামীদের দায়রা সোপর্দ করা হয়। আলিপুরের অতিরিক্ত জজ মিঃ বিচক্রফটের এজলাসে আসামীদের বিচার শুরু হয়। সব কিছু আগে

অন্যতম আসামী নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে অরবিন্দদের ষড়যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের আদালতে প্রকাশ্য বহু গুপ্তকথা সবিস্তারে প্রকাশ করে। বিপ্লবীরা নরেন গোঁসাইকে আলিপুর জেলের মধ্যেই গুলি করে মেরেছিল। আলিপুরে দায়রা জজের কোর্টে এই মামলার বিচার হয়েছিল। সেইজন্য ইতিহাসে এর পরিচয় আলিপুর বোমার মামলা বলে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই মামলার সঙ্গে ভারতের দুজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের নাম সংযুক্ত হয়ে আছে — তাঁদের মধ্যে একজন অরবিন্দ ঘোষ, অন্যজন চিত্তরঞ্জন দাশ। একজন আসামী, অন্যজন তাঁর কৌঁসুলী। রাজনৈতিক আসামীদের বিচার হিসেবে এটাই হল ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত মামলা। এই মোকদ্দমাই চিত্তরঞ্জনকে গৌরবের সোপানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, তাঁকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার হিসেবে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। আজও লোকেরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, এই মামলাটি তিনি পরিচালনা করেন বিনা পারিশ্রমিকে। শুধু তাই নয় এজন্য তাঁকে অনেক টাকা দেনা করতে হয়েছিল, এমন কি নিজের জুড়ি গাড়িটা পর্যন্ত বিক্রী করতে হয়েছিল। মামলা যখন শেষ হয় তখন দেখা গেল চিত্তরঞ্জনের পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনা হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আর কোন আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জন্য এইভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছেন বলে শোনা যায় নি।

যেদিন চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ ও অন্যান্য আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আদালতে দাঁড়ান, সেদিন থেকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস

তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রাত জেগে তিনি এই মামলার কাগজপত্র পড়তেন, পরের দিন আদালতে কি বলবেন তা চিন্তা করে ঠিক করতেন। প্রথম থেকে মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দকে খালাস করে আনবেই হবে — এই ছিল চিত্তরঞ্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। শুধুমাত্র অর্থ দেন না, তাঁর স্বাস্থ্যেরও হানি হয়েছিল। প্রায় নয় মাস তিনি এই মামলার পেছনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

একদিন। বিচারপতির এজলাসে মামলা চলছে। একপাশে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন, অন্যপাশে নর্টন সাহেব। দুজনেই যশস্বী। আসামীরা লোহার খাঁচার মধ্যে শিকলবাঁধা। হঠাৎ কি একটা আইনের অর্থ নিয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিচারকের মতভেদ হল। খানিকটা তর্কবিতর্কের পর, জজ সাহেব চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি মনে রেখে কথা বলবেন, মিস্টার দাশ।' গোটা আদালতশুদ্ধ লোক চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখা গেল তাঁর চোখ-মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে যা একবার দেখলে আর সহজে ভোলা যায়না। চিত্তরঞ্জন আইনের মোটা বইখানা বন্ধ করলেন। তারপর বুক ফুলিয়ে বিচারকের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে জজের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি বিচারকের আসনে বসেছেন; এই বাণী আপনার মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া অশোভন। এটা যদি অন্য কোথাও হত, আপনি আমার কাছ থেকে এর সমুচিত জবাব পেতেন।' জজসাহেবের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। নিমেষের মধ্যে সবাই অনুভব করলো চিত্তরঞ্জনের প্রাণের মধ্যে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনের উত্তাপ

15099

তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রাত জেগে তিনি এই মামলার কাগজপত্র পড়তেন, পরের দিন আদালতে কি বলবেন তা চিন্তা করে ঠিক করতেন। যেমন করে হোক মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দকে বাঁচাতে হবে— এই ছিল চিত্তরঞ্জনের তখনকার একমাত্র চিন্তা। পয়সা কড়ি নেন না, তাঁর স্বাস্থ্যেরও হানি হয়েছিল। প্রায় দশ মাস তিনি এই মামলার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

একদিন। বিচারপতির এজলাসে মামলা চলছে। একপাশে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন, অন্যপাশে নর্টন সাহেব। দুজনেই প্রতিদ্বন্দ্বী। আসামীরা লোহার খাঁচার মধ্যে শিকল-বাঁধা। হঠাৎ কি একটি আইনের অর্থ নিয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিচারকের মতভেদ হল। মাননীয় জজ বিরক্তির সঙ্গে হঠাৎ চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি সব কথা বলছেন, মিস্টার দাশ।' গোটা আদালতশুদ্ধ লোক চিত্তরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখা গেল তাঁর চোখ-মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছে যা একবার দেখলে আর সহজে ভোলা যায় না। চিত্তরঞ্জন আইনের মোটা বইখানা বন্ধ করলেন। তারপর বুক ফুলিয়ে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর গম্ভীর গলায় জজের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি বিচারকের আসনে বসেছেন; এই কথা আপনার মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া অশোভন। এটা যদি অন্য কোথাও হত, আপনি আমার কাছ থেকে এর সমুচিত জবাব পেতেন।' সাহেবের মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। নিমেষের মধ্যে সবাই অনুভব করলো চিত্তরঞ্জনের প্রাণের মধ্যে একখানি আগুন। সেই আগুনের তেজটা

যেদিন ফাঁসির দন্ড কিংসফোর্ড আদালতেই অনুভব করেছিলেন, এবং এই ঘটনার পর থেকে তিনি ব্রিটিশদের ঘৃণ্য আদালতে আর কোনদিন অশিষ্ট আচরণ দেখান নি।

মোকদ্দমার শুনানী চলেছিল দীর্ঘ সাত মাস। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন সওয়াল করতেন। পুলিশের অভিযোগ তিনি একেবারে ভুলুণ্ঠিত করে দিলেন। প্রধান আসামী অরবিন্দের দেশপ্রেমকেই তিনি তাঁর সওয়ালে বিশেষভাবে তুলে ধরলেন। শেষের নয়দিন তিনি যে সওয়াল জবাব করেছিলেন তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাঁর শেষ বক্তৃতা ছিল যেমন ওজস্বিনী, তেমনি যুক্তি-তর্কপূর্ণ। [redacted] তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে উদাত্তগম্ভীর স্বরে বললেন:

"আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি এইটুকু নিবেদন করছি যে, এরপরে যখন সকলে বাদানুবাদ থেমে যাবে, যখন এইসব আন্দোলন ও কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবে, এই আসামী অরবিন্দ ঘোষও মারা যাবেন, তারো পরে– বহুকাল পরে– পৃথিবীর লোক বলবে যে, ইনি ছিলেন দেশপ্রেমের প্রেম কবি, জাতীয়তার অগ্রদূত আর মানবতাবাদের নিঃস্বার্থ প্রেমিক। ইনি যখন এ জগতে থাকবেন না, তখনো পর্যন্ত এঁর বাণী কেবল ভারতের মধ্যেই নয়, স্বদেশ ছাড়িয়েও দূর-দূরান্তরের সাগরপারে সকল দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হয়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলছি যে, ই মানুষটি আর কেবল এই আদালতেরই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার চাইছেন না। ইনি এসে এখন দাঁড়িয়েছেন ইতিহাসের মহা আদালতের কাঠগড়ার সামনে।"

উইনে রায় বেরুলো। বিচারক অরবিন্দকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করলেন ও তিনি সসম্মানে মুক্তিলাভ করলেন। তখন উৎসাহিত দর্শকদের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে চিত্তরঞ্জন বিজয়ী বীরের মতো তাঁর মক্কেলের হাত ধরে কোর্টের বাইরে চলে গেলেন। তাঁরা দুজনে বাইরে আসামাত্র সমবেত জনতার মাঝে উঠেছিল বিপুল হর্ষধ্বনি। কিন্তু এইখানেই এই মামলা শেষ হলো না। বিচারে বারীন্দ্র এবং উল্লাসকরের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। অন্যান্য আসামীদেরও গুরুতর শাস্তি হয়েছিল। তখন হাইকোর্টে তাঁদের হয়ে আপিল করা হলো। সেখানেও দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন তাঁর আইনজ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দিলেন। হাইকোর্টে এই আপিলের মামলার শুনানী হয়েছিল খুব বেশী। আপিলের মামলায় বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের দণ্ড মকুব হয় ও তাঁরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন

১৯০৭ সাল থেকেই বাংলার রাজনীতিতে প্রতিদিন নতুন নতুন ঘটনার অবতারণা হচ্ছিল। প্রত্যেক ঘটনায় একজন ব্যক্তিকে প্রধান ভূমিকায় দেখা দিয়েছিল। তিনি ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর নৈপুণ্যের কার্যকলাপ দেখে মনে হতো সব আসামী- আসামীর নেতার প্রশংসা বেড়ে উঠেছিল। অনেকেই উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মামলায় তিনি দাঁড়িয়েছেন আসামী পক্ষ সমর্থন করে। দাঁড়াতেন বিনা পারিশ্রমিকে। তখন থেকেই — কি দীনদারি, কি দেওয়ানী, উভয় ক্ষেত্রেই দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার হিসাবে উপার্জন ভালো করতে শুরু করেছিল। তাঁর জীবনের নতুন রূপ তখন থেকেই প্রতীয়মান রাখিতে থাকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। ভাগ্যলক্ষ্মী যেন যেচে যেন তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন। সোনার থালা হাতে নিয়ে লক্ষ্মী এলেন তাঁর বাড়িতে।

॥ চার ॥

চিত্তরঞ্জন ধাপে ধাপে আইন-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগলেন। লক্ষ্মীও ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয়ে তাঁর সেবার ঘরে আসনখানি পাতলেন ১৪৮ নম্বর রসা রোডের বাড়িতে। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই তাঁর ব্যারিস্টারি-জীবনে হলো স্বর্ণযুগ। কি ফৌজদারি, কি দেওয়ানি সব মামলাতেই তাঁর তীক্ষ্ণ আইনজ্ঞানের পরিচয় থাকত। কিন্তু শুধু এই জন্যেই তিনি পেশার শীর্ষস্থানে ওঠেননি। বাকপটুতা, আইনজ্ঞান, চমৎকার মস্তিষ্কের ক্ষমতা ছাড়াও তাঁর আরো একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কোন বিচারকের অনুগ্রহপ্রার্থী হতেন না। পেশায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। যখনি কোন মোকদ্দমা নিতেন তার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেন। তন্ন তন্ন করে নথিপত্র পাঠ করতেন। পারিশ্রমিক পেতেন কি দিল বা না দিল সেদিকে না তাকিয়ে তিনি যে মামলাটি হাতে নিতেন সে বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন ফাঁকি দিয়ে বিখ্যাত আইনজীবী হননি।

অবশ্য যখন তাঁর উপায় ফিরল তখন চিত্তরঞ্জন বাবার দেনা পরিশোধের একটা চেষ্টা করলেন। না করলেও পারতেন, কেননা [redacted] এই দেনা শোধ না করলেও কিছু যায় আসত না। আইনত তিনি এই দেনা শোধ না করলেও পাওনাদারদের কিছু বলার ছিল না। কিন্তু মানুষ চিত্তরঞ্জন অন্য ধাতু দিয়ে গড়া ছিলেন। আইনের চেয়ে তাঁর কাছে বড়ো ছিল বিবেক। [redacted]। তাই অল্পদিনে তিনি পিতার বাবাকে ঋণমুক্ত করলেন — এই ছিল ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের সর্বক্ষণের চিন্তা। ১৯১৩ সালে যখন তিনি আইন-ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন, তখন থেকেই

চিত্তরঞ্জন সমস্ত দেনা শোধ করে দেউলিয়া আদালত থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকেন। এই কষ্টের যে মাসে তিনি সুদে-আসলে প্রত্যেক ঋণ পরিশোধ করে দেউলিয়া নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে যেদিন তাঁর কৌঁসুলি এই বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টে বিচারপতি ফ্লেচারের এজলাসে দাঁড়ালেন সেদিন মাননীয় বিচারপতি এই মন্তব্য করেছিলেন: 'কোন লোক দেউলিয়া হবার পরে নিজের ইচ্ছায় সেই দেনা স্বীকার করে তা সুদে-আসলে পরিশোধ করেন, এমন দৃষ্টান্ত আমি এই প্রথম দেখলাম।'

পুরুলিয়াতে ভুবনমোহনের ওখানে নিজস্ব বাড়ি ছিল। সেইখানে বসে তিনি যখন এই সংবাদ শুনতে পেলেন, তখন বৃদ্ধ নিশ্চয়ই [illegible] মনে মনে খুব গর্ব অনুভব করেছিলেন। সেদিনে সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য, সর্বোপরি [illegible] জন্য নিজে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করলেন, সেই চিত্তরঞ্জন এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সেদিন তাঁর দেশবাসী বুঝেছিল, চিত্তরঞ্জন অর্থসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না। ব্যারিস্টারিতে তিনি দু'হাতে লেন, দশহাতে টাকা উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু টাকার ওপর তাঁর একটুকু মোহ ছিল না। টাকার চেয়ে আত্মসম্মান বড় — এই বোধ ছিল বলেই না তিনি সুদসুদ্ধ ঋণ শোধ করেছিলেন।

একেই বলে মহত্ত্ব। একেই বলে মনুষ্যত্ব।

ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন যখন কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম প্র্যাকটিস করতে যান তখন তাঁর বয়স মাত্র তেইশ বছর। পরপর কয়েক বছর আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। আবার যখন

মামলায় তিনি পারিশ্রমিক নেন নি তার হিসাব করলে অন্যায় আপত্তি অনেক লক্ষ টাকায় গিয়ে পৌঁছবে। প্যারিস থেকে তাঁর সমাজ-জগৎ কাটিয়ে আসত, প্রবন্ধ যেমন সত্য, তেমনি দশ হাজার টাকা দান করলেন, এ কথাও সমান সত্য। কিন্তু আইনজীবি চিত্তরঞ্জনের জীবনটাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আইনজ্ঞের আড়ালে তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। তিনি সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী আমাদের দেশপ্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই দেশপ্রেমের উৎস কোথায়?

এর উৎস কবি চিত্তরঞ্জনের মধ্যে। আইনজীবী চিত্তরঞ্জনের মনের গভীরে ছিল একজন কবি – মানবতার কবি। সে তাঁর মনের মধ্যে আত্ম-জীবন যে তখনও জ্বলেছিল তারই সুরে আইনজীবী চিত্তরঞ্জন হয়ে গিয়েছিলেন দেশপ্রেমিক। এইবার আমরা কবি-চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। [redacted] তাঁর জীবনের একটি প্রধান ঘটনার কথা আমরা এখনো পর্যন্ত উল্লেখ করিনি। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর বছর পাঁচ, ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জনের জীবনে তাঁর জীবন সঙ্গিনী হয়ে আসেন বাসন্তী দেবী। ইনি ছিলেন আসামের বিজনী স্টেটের দেওয়ান বরদানাথ হালদারের বড়ো মেয়ে। তিনি সর্বাংশেই দেশবন্ধুর যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন।

কবিতা

আইন ছিল চিত্তরঞ্জনের জীবিকা, কিন্তু কবিতা ছিল তাঁর জীবন। তাঁর দেশপ্রেমের সাথে সাহিত্য-প্রীতিকে মিলিয়ে দেখতে হবে। অনুরাগী ছিলেন জীবন-রসিক।

সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর ও সহজাত। যেমন কল্পনাপ্রবণ তেমনি আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনে কয়েকটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যার অনেকগুলি চরিতার্থ হয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি কবি হবেন। কবি তিনি হয়েছিলেন ঠিকই, তবে যতখানি প্রতিভা ও শক্তি ছিল, সময়ের অভাবে সেই প্রতিভা ও শক্তির পরিপূর্ণ স্ফূর্তি ঘটতে পারেনি।

তবু একথা সত্য যে, ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ এক সময়ে সাহিত্য-সমাজে কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বাংলার কাব্য-সংসারে একটি সহজাত কবি প্রতিভা নিয়েই তিনি প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর জীবনে আইন-ব্যবসায় ও সাহিত্য-কর্ম — এই দুটি জিনিসই একযোগে আরম্ভ হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন প্রথম খাঁটি কবি ছিলেন। বাংলার মাটি, বাংলার প্রাণ, বাংলার গীতিকবিতার ঐতিহ্য থেকেই তিনি পেয়েছিলেন অনুপ্রেরণা। তাঁর কন্যা অপর্ণাদেবী 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' বইটিতে লিখেছেন: 'কবি যদি কেউ হয়ে থাকেন, তবে চিত্তরঞ্জন ছিলেন বাংলার কবি, বাঙালির নিজস্ব কবি।'

চিত্তরঞ্জনের কবিতায় আমরা পাই প্রাণের স্পর্শ, অনুভূতির তীব্রতা, আবেগের গাঢ়তা আর অতীন্দ্রিয়চেতনা। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, চিত্তরঞ্জন কবি কেমন ছিলেন? — তাহলে তার উত্তরে আমরা বলব আসলে তিনি ছিলেন প্রথম গীতিকবি — উৎকৃষ্ট গীতি কবি। তারপর যখন তিনি বিচিত্র কবিতার আনন্দ ও মাধুর্যের সন্ধান পেলেন তখন থেকেই তাঁর কবিতায় ঝঙ্কৃত হতে থাকে ভক্তির অন্তর্লীন সুর যা একদিন তাঁর পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছিল।

চিত্তরঞ্জনের রচনার পরিমাণ সামান্যই, মাত্র পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ। সেগুলি আকারে-আয়তনে খুব বড়ো নয়। তবু সেগুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ পাঠক কবি চিত্তরঞ্জনকে দেখতে পাবেন। 'মালঞ্চ' তাঁর প্রথম বই। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাত যাবার সময় জাহাজেই তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাগুলিই চয়ন করে নবীন কবি তাঁর প্রথম কাব্য নিবেদন করেন 'মালঞ্চ' নাম দিয়ে। বইটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর। তাঁর জীবনের তৃতীয় দশক সুখেদুঃখে ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কেটেছে। সেই কৈশোরজীবনের প্রতিফলন ঘটেছে মালঞ্চের কবিতায়।

(প্রতিটি কবিতার ভাষা সরল, ভাব সুন্দর, আর মর্মস্পর্শী

'মালা' চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের আগাগোড়াই শান্ত, গম্ভীর, মৌন বিষাদের সুর শোনা যায়। তাঁর কবি চেতনায় এসেছে গভীরতা আর কবিদৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বিশ্বাস। একদিকে পার্থিব প্রেম, অন্যদিকে ঐশ্বরিক প্রেম — এই দুটি ধারা এই কাব্যের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে। 'প্রেম ও প্রদীপ' এই কাব্যের একটি সুন্দর কবিতা। প্রত্যয়ের সুরে কবি লিখেছেন:

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে ও কক্ষায়তনে
কেন রাখিয়াছ ওগো প্রদীপ জ্বালিয়া রে
তোমার ও প্রদীপের স্পন্দন-হিল্লোলে
আমার সকল প্রাণ উঠে উজলিয়া।

পূর্ণ করে দাও আমি শান্ত এ হৃদয়
হে প্রসন্ন! হে সম্পূর্ণ! নীরবে নিভৃতে
নিঃশব্দে বেজিয়া দাও অন্তরে নিলয়
ওই তব শব্দহীন সঙ্গীতে।

অন্ধকার যেন এই সন্ধ্যার মাঝারে
যেন গো কাঁদিলে দিদি, খুলিলে দুয়ার—
যেন গো এসে ঘরে ডাকিছ আমারে
সমস্ত প্রাণের বীর = সকল আমার।

এই কাব্যেই দেখতে পাই কবি তাঁর শূন্য প্রাণ পূর্ণ করে দেবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন এই লেখে:

ভরি দিত শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায়।
দুয়ার খুলিয়া দিত তব মহিমায়।

সা.সংগীত

১৯১৩ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সাগর সঙ্গীত'। (১৯১০) চিত্তরঞ্জনের কবি-প্রতিভার ■ এক সার্থক সৃষ্টি। যে কদিন তিনি সপরিবারে দিঘাতে ছিলেন, এই কাব্যখানির রচনার সূত্রপাত হয় তখন। দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল নীল জলরাশি, অনন্ত বিস্তৃত নীল আকাশের সঙ্গে মিলে যে উচ্ছল নৃত্য সঙ্গীত রচনা করেছে, কবি সেই নৃত্য আর সঙ্গীতকে কাব্যের ছন্দে গেঁথে রচনা করেছেন 'সাগর সঙ্গীত'। বাংলা কাব্যসংসারে এমন গভীর ও উচ্ছ্বাসে সিন্ধু সুর এর আগে আর শোনা যায়নি।

এই কাব্যের প্রধান সুর হলো আত্মসমর্পণ। তাই তো কবি গেয়ে উঠলেন:

সকল দুঃখের কান্না মুখর হয়ে ফুটে
সব দুঃখ আজ মোর গীত হয়ে উঠে।
... ...

তোমারি এ গীত গানে সারা দিন যায়, —
আমি যে হয়েছি তব গন্ধে বিলীন।
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! — বাজাও আমারে
নিজ মন-তন্ত্রী ধরি আপনার ঝংকারে,
সমস্ত নিশিদিন, নিত্য অবকাশে।
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়—
আবার অন্তহীন, উদাসী সন্ধ্যায়!

এই কবিতাটিতে আমরা যে হৃদয়ের পরিচয় পাই, কিশোরকালের কাব্যলিপি-চর্চার মধ্যেও সেই হৃদয় তেমনি আবেগময় ছিল। আবেগের আর একটি অবকে এর সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে:

তরঙ্গে তরঙ্গে আজ সেই গীত বাজে,
সোনার স্বপনে ঘেরা প্রভাতের মাঝে;
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,
তাহারে পরশে বহে সেই গীতধার!
কি মোরে করেছ আজ! অনাথিনী মম
শত শত ঝংকারে গীত-মগ্ন মন,
পরশি তোমার স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
তারে তারে আমি উঠেছি বাজিয়া!

কবি তাঁর কাব্যখানি শেষ করেছেন আত্মসমর্পণের সুরে:

হে মোর অসীম সখা! কাণ্ডারী আমার
আর মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।

শ্রীঅরবিন্দ এই কাব্যটির একটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন তাঁর বন্ধুর অনুরোধে এবং সেই অনুবাদই চিত্তরঞ্জনের 'সাগর সঙ্গীত'-কে সাহিত্যজগতে একটি চিরন্তন মর্যাদা এনে দিয়েছিল। এই অনুবাদের জন্য তিনি বন্ধুর কাছ থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে পেয়েছিলেন এক হাজার টাকা।

চিত্তরঞ্জনের চতুর্থ কাব্যটির নাম 'অন্তর্যামী'। নামের মধ্যেই আছে তার পরিচয়। কবি এখানে একজন ভক্ত। তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ এখন যেন আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। তাইতে তাঁর কণ্ঠ-বীণায় বেজে উঠলো:

সকল দরশ মাঝে তুমি উঠ জেগে।
সকল পরশ মাঝে তুমি উঠ জেগে।
সকল শ্রবণ মাঝে তোমারেই শুনি!
সকল গানের মাঝে তব গান গুনি!
ওগো তুমি আমাদের ঘর-আঙিনার!
সাথী তুমি সাক্ষী তুমি সব ভাবনার।

এই ভাবেরই পরিপূর্ণতা ফুটে উঠেছে তাঁর শেষ কাব্যটিতে। এর নাম 'কিশোর-কিশোরী'। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে এইটি সর্বাধিক গীতিকাব্য। শৈশবে যিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে বড়ো হয়ে তিনি একজন কবি হবেন, চিত্তরঞ্জনের সেই স্বপ্ন অনেকখানি চরিতার্থ হয়েছিল। আইন ও

রাজনীতি যদি তাঁর সময়ের অনেকখানি গ্রাস না করত, যদি তিনি কাব্যসাধনায় সম্পূর্ণ মন দিতে পারতেন তাহলে চিত্তরঞ্জন যে বাণীর মন্দিরে আরো কিছু অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাঁর সাহিত্য-সাধনার আর একটি নিদর্শন 'নারায়ণ'। এই মাসিক পত্রিকাটি চিত্তরঞ্জন প্রকাশ করেন ১৩২১ সালে ও তিনিই ছিলেন এর সম্পাদক। বাংলা সাহিত্যজগতে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, একটা নতুন আদর্শ নিয়েই 'নারায়ণের' আবির্ভাব ঘটেছিল। এর সমস্ত ব্যয় তিনিই বহন করতেন। তাঁর সাহিত্য-কর্মের বিশেষ নিদর্শন এই 'নারায়ণ'। চিত্তরঞ্জন যেমন কবি ছিলেন তেমনি একজন ভালো গদ্যলেখক ছিলেন। (২ উৎকৃষ্ট) গদ্য ও পদ্য উভয় দুইই তিনি লিখতে পারতেন। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর 'ডালিম' গল্পটি পাঠ করে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হয়েছিলেন। তখনকার দিনে সকল (১ খ্যাতিমান) শ্রেষ্ঠ লেখকই চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে তাঁর নারায়ণ-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

চিত্তরঞ্জন বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্য বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, ইংরেজি-নবিশ বাঙালির কাছে এই সংস্কৃতির কিছুমাত্র আদর নেই। এদেরই সচেতন করবার জন্য ও সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে একটা নতুন রূপ দেবার জন্যই তিনি 'নারায়ণ' পত্রিকাটি বের করেছিলেন। বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন যে স্বদেশী খাঁটি বাঙালী ছিলেন, স্বদেশের সাধনা ও সভ্যতার প্রতি তিনি যে কি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন তারই নারায়ণ ছিল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই পত্রিকায় চিত্তরঞ্জন যে কয়টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ [redacted] লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো 'বাংলার গীতি-কবিতা'।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্রকরের আর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ ছিল রূপান্তরের কথা। যেমন সুন্দর তেমনি সারগর্ভ। তিনি লিখেছেন: 'তার যখন সত্যই মনের কাছে কী দেয় তাই তাহা শুধু মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন যাবৎ-য়ে প্রতিভাত হয়, তার রূপ সেই আধারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে আর কাল্পনিক নহে, মনের প্রলাপ নহে, তাহা রূপ, তাহাই সত্য-স্বরূপ। সত্যের মধ্যে নিত্য যে লীলা চলিয়াছে অন্তরে বাহিরে ও অন্তরে পার্থক্য নাই। সে লীলা আত্মলোকের নিভৃত মিলনক্ষেত্র।" অনুভূতি যতখানি প্রসারিত হলে তবে কথা বোঝা যায়, তখন কথা বেশ তত ভাল অতই সুন্দর দৃষ্টান্ত চিত্রকরের এই প্রবন্ধটি।

প্রবন্ধে যেমন, তার রচনাতেও তেমনি দক্ষ ছিলেন চিত্রকর। এটা তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। তাঁর বড় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুগায়ক ছিলেন। ব্রহ্মসংগীত বইতে তাঁর লেখা অনেক গান আছে। চিত্রকর নিজে বলেছেন, 'গান ও কবিতা আমি ছেলেবেলা থেকেই লিখতাম।' তবে যেমন সুগায়ক ছিলেন, তেমন ঠিক সেইরকম ছিলেন না, কিন্তু গান তিনি খুব ভালবাসতেন এবং শান্তিনিকেতনে ছেলেমেয়েদের কাছে পর্যন্ত তাঁর রচিত গান নিয়মিত গাওয়া হত। বাউল গানই ছিল তাঁর প্রিয়। 'সবুজপত্র' পত্রিকায় তাঁর লেখা একটি গানের মধ্যে এই গানটি সেইসময়ে খুব সুখ্যাতি পেয়েছিল:

নামিয়ে দাও ভারের বোঝা
সইতে নারি বেকার বোঝা।
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে ওঠে

নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন-চূড়া,
সেই তো হাতে মোহন-বাঁশী,
সেই মুরলি মোহন বলে
পরাণ যত অভিলাষী;
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ দুয়ার
এস আমার পরম মানিক
বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর।

চিত্তরঞ্জনের এই মাসিক পত্রিকাখানি বেশি দিন চলেনি, তবু এ কথা বলতে বাধা নেই যে, সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায় ও প্রবন্ধগৌরবে— সব দিক থেকেই নারায়ণের বসুমতীর উপরে সাহিত্যের নবযুগের নিশান উড়েছিল। এই কাগজটির জন্য তিনি অনেক টাকা ব্যয় করেছিলেন, লেখকদের উপযুক্ত দক্ষিণা দিতেন। অনেক সাহিত্যিক পরবর্তীকালে এই পত্রিকায় প্রথম গল্প লিখেছিলেন; চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকেই তাঁর পরিচয় —সেই পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল যে দেশবন্ধুর আহ্বানে শরৎচন্দ্র স্বরাজ্যদলে যোগদান করেছিলেন ও বিপ্লবের সম্মেলন জুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। নিজের অর্থে অপরের, বাংলার অনেক সাহিত্য-সমিতি ও সাহিত্যিক পত্রিকার জন্য চিত্তরঞ্জন অকাতরে সাহায্য করতেন। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যকর্ম তাঁর কাছে নিছক ক্ষণিক আমোদের বিষয় অথবা বিলাসিতার বিষয় ছিল না। স্বদেশপ্রেম ছিল তাঁর সকল সাহিত্য-কর্মের উৎস।

॥ পাঁচ ॥

১৯১৭, এপ্রিল মাস।
চিত্তরঞ্জনের জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায়।
আমাদের জাতীয় জীবনেও এটি একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

বাংলার রাজনীতিতে তখন একরকমের শূন্যতা বিরাজ করছিল। বাংলার
অগ্নিমন্ত্রের তরুণ দূতেরা তখন দ্বীপান্তরে ও কারাগারে। অরবিন্দ চলে গিয়েছেন সুদূর
পণ্ডিচেরিতে; সেখানে তিনি তখন হয়েছেন দিব্যজীবনের সাধক। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা
আরো নরম হয়ে ইংরেজের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। চরমপন্থীরা নেতার অভাবে নীরব।
ঘটনা আরো অনেক ঘটে গেছে। বঙ্গভঙ্গ [redacted] রদ হয়েছে, কলকাতা থেকে
য়ুরোপের আকাশে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা।
রাজধানী দিল্লীতে [redacted] উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিল দক্ষিণ
মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর
আফ্রিকা থেকে সত্যাগ্রহের জয়তিলক ললাটে নিয়ে ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ। সর্ব-
ভারতীয় কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে দেখা। দুটি যুগের মধ্যে, আমরা দেখতে পাব, বাংলার
চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হবেন গান্ধী এবং এঁরা দুজনে জাতীয় কংগ্রেসকে দেবেন
নব যুগের নেতৃত্ব। কিন্তু সে ইতিহাস যথাস্থানে বলা হবে।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে ভবানীপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেস
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। চিত্তরঞ্জনকে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য
প্রবীণ
অনুরোধ করা হলো। তিনি রাজী হলেন। নরমপন্থীদের সুরেন্দ্রনাথই এই ব্যাপারে
আগ্রহী ছিলেন এবং তিনিই নিজে চিত্তরঞ্জনকে হাত ধরে মঞ্চে নিয়ে গিয়ে দেশবাসীর
কাছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দেন। এটাই ছিল চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক অভিষেক।
বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই অধিবেশন। ভবানীপুর [redacted] সম্মেলন নামে

ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাংলার সবদিক দিয়েই দেখিতে হইবে। তাই আজ এই অবসরে যাহা বাংলার কথা বলিতে আসিয়াছি। বাঙালির একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালির একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বাঙালিকে প্রকৃত বাঙালি হইতে হইবে।'

'বাঙালিকে প্রকৃত বাঙালি হইতে হইবে' — চিত্তরঞ্জনের এই একটি কথা কালের প্রাচীর অতিক্রম করে এসেছে আমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে। বাঙালির হৃদয়ের যত কিছু চিন্তা-ভাবনা, যত কিছু অনুভূতি একটি পরিষ্কার অভিব্যক্তি সেদিন সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল 'বাংলার কথা'র মধ্যে। এমন প্রাণস্পর্শী, এমন খাঁটি বস্তুত বাঙালি এর আগে আর কোন বক্তার মুখে শোনেনি। 'বাংলার কথা' চিত্তরঞ্জনের প্রাণের কথা আর এই দিয়ে তিনি রচনা করলেন বাংলার রাজনীতির প্রথম মন্ত্র-সংহিতা। আর, এত বছর পরে, আমরা যখন এই বক্তৃতাটি পাঠ করি, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে এর মূল কথা ছিল মাতৃভূমির দেশের কাজের প্রতি বাংলার ছেলেদের আহ্বান করা। সেকালে নেতারা রাজনীতির কথা বলতেন, কিন্তু এর আগে দেশের লোক শুধু ভিক্ষার আবেদন শুনেছে, কাজের কথা চিন্তা করেনি কখনো।

তাই তো চিত্তরঞ্জন বললেন: 'আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিপদ যে, আমরা ক্রমশই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার অনেকটা ইংরাজি অবলম্বন করিয়া বসিয়াছি।... আমরা ভাব করি, বক্তৃতা করিয়া, লেখা লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু যাহা আবশ্যক তাহা করি না। দেশের প্রতি প্রেম

ভুলিয়া যাইব না; বাংলার কথা, বাঙালির কথা ভাবিব না, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠানকে সর্বতোভাবে প্রভু করি। সেইজন্যই আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন।'

বক্তৃতার উপসংহারে চিত্তরঞ্জন স্বদেশবাসীদের কাছে তাঁর প্রাণের নিবেদন রাখেন ও যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তার তুলনা মেলে না। তিনি বলেছিলেন:

'বাংলার কথা যেন অচিরে বাঙালির যথার্থ পরিচয় হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙালির স্বাধীনতা চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ ইহা আজ হইতে সর্বস্ব প্রাণ আরম্ভ করিতে হইবে। সকলে মিলিয়া, সকলে প্রাণ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলকে আত্মদান করিতে হইবে। ঈশ্বরদত্ত মানবের দাবী, অলঙ্ঘ্য বিধি। আমরা কিছু ভিক্ষা চাহিতেছি না। যে অধিকার আজ আমরা দাবী করিতেছি তাহা যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, আমাদের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার হইতে কেহ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।'

সেদিন, ১৯২২, মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে অভিভাষণের মধ্যে দেশবন্ধুর যে জয়গাম্ভীর্য বেজে উঠেছিল, [ছন্দ অনুসরণ করেই] আমরা দেখতে পাব, তা উচ্চারণে উঠে, বাংলার মানুষের অন্তরের সঞ্চিত করে তুলেছিল। দেখতে পাব তিনি কেমন করে তাঁর দুর্জয়ী দেশপ্রেমের সংগ্রাম শুরু করে দিয়ে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ে। তাঁর জীবনের সেই অধ্যায় গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা এবার আমরা আলোচনা করব।

—

॥ ছয় ॥

১৯১৪ সাল থেকেই কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়েই ভারতের আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই পরিবেশেই লোকমান্য তিলক ও অ্যানী বেশান্ত ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবী করে প্রতিষ্ঠা করেন একটি নতুন দল — 'হোমরুল লীগ'। কংগ্রেস থাকতে আবার একটা নতুন রাজনৈতিক দলের দরকার হয়েছিল কেন? হয়েছিল এই জন্যে যে, কংগ্রেস তখন নামে মাত্র, এর পুরোভাগে তখন যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ছিলেন ইংরেজ সরকারের উপর আস্থাশীল, শক্তি ও বলের বদলে তাঁরা ছিলেন আবেদন-নিবেদনের পক্ষপাতী। বিবেকানন্দের স্বামী মানসকন্যা নিবেদিতা যেমন ভারতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তেমনি ওঁর মতন বিদেশিনী অ্যানী বেশান্তও ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

ভারতের জন্য 'হোমরুল' (Home Rule) বা স্বায়ত্ত শাসন দাবী করে অ্যানী বেশান্ত দেশের নানা জায়গায় বক্তৃতা করতে লাগলেন। সরকার পক্ষের এই ব্যাপারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ও উটাকামন্দে অন্তরীণ রাখা হয়। মাদ্রাজের লাট সাহেবের আদেশে বাংলা দেশে তখন চিত্তরঞ্জন তাঁর জাতীয়দলের অনুগামীদের নিয়ে বেশান্তের হোমরুল লীগে যোগদান করেছিলেন। বেশান্তকে অন্তরীণ রাখার বিরুদ্ধে সারা ভারতে সমস্ত জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। বাংলায় তার ঢেউ দেখা দিল প্রবল আকারে। দেশময় প্রতিবাদের সভাসমিতি। কলকাতায় যে সভা হয়েছিল তাতে চিত্তরঞ্জন বললেন তাঁর বক্তৃতায়: "অত্যাচারীরা বারবার সত্যকে পদদলিত করতে চেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই পরাজিত হয়েছে।" সেদিন, এই সভায় চিত্তরঞ্জনের পাশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথও একটি বক্তৃতা করেছিলেন।

এই সময় ঘোষণা করা হয় যে, ভারতসচিব মন্টেগু ভারতে

আসছেন [redacted] ১৯১৭ সালের শেষ দিকে; ভারতবাসীকে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া
< সকল দলের
সম্বন্ধে তিনি তখনকার ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। স্বাধীনতাকামী
দলের নেতারা অনুভব করলেন যে এখন থেকেই দেশের স্থানে স্থানে সভা-সমিতি করা
দরকার। দেশবাসী যেমন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্য — এই কথাই দেশের সমস্ত দল
যাতে একবাক্যে বলতে পারে সেইজন্যই সভা করে জনমত জোরদার করতে হবে। সামনেই
পূজোর ছুটি; হাইকোর্ট অনেক দিন বন্ধ থাকবে। চিত্তরঞ্জন বেরুলেন পূর্ববঙ্গ সফরে।

সঙ্গে সঙ্গে মৈমনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে তিনি স্বায়ত্তশাসনের ব্যাখ্যা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। মৈমনসিংহের বক্তৃতায় বললেন: 'দেশই আমার ধর্ম, আমার চিরজীবনের আদর্শ — ঐ দেশ। দেশ বলিলে আমি জননীর সম্মুখে আমার ভগবানকে দেখিতে পাই... আপনারা দেশ ও পরনীতি হৃদয়ে ধরিবেন না।' ঢাকার বক্তৃতায় বললেন: 'স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে সরকার আমাদিগকে অধিকার দিবেন, যতটুকু অধিকার চাহিলে তাহা অর্থহীনে প্রাপ্তির দিকে ফিরিবার আবশ্যকতা নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহাই চাহিতে হইবে, ভীত হইবেন না, দেশের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা নির্ভয়ে দাবী করিতে হইবে।... জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত বৈষম্য দূর করিতে ও দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যই আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই।'

বরিশালের বক্তৃতায় বললেন: 'ইহা হিন্দুর স্বায়ত্তশাসন হইবে না, ইহা মুসলমানের স্বায়ত্তশাসন হইবে না — ইহা হইবে জনগণের স্বায়ত্তশাসন। ইহাতে সকলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত থাকিবে।' চিত্তরঞ্জনের 'বাংলার কথা' পত্রিকা ও এ-রকম প্রচার

বাংলা থেকে দেশের লোক তখন থেকে চিত্তরঞ্জনকে দেশের নেতা বলে বরণ করে নিল। ভবানীপুর প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন সেটিই প্রথমে তাঁর দেশপ্রেমী চিত্তরঞ্জনের স্বদেশপ্রেমের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পেয়েছিল। দুই কথা সময়ে বেড়িয়ে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই মধ্যে দেশ অসম্পোষিত ভাবে [illegible] আত্মশক্তির প্রতি [illegible] অসম্মতি।

১৯১৭

মন্টেগু ভারতবর্ষে এলেন।

ভারতসচিব সার [illegible] নিলেন লর্ড [illegible]।

নেতাদের অনুরোধে তখন হোমরুল আন্দোলন অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের দাবী — এই ছিল উভয়ের মাঝে। মন্টেগু পুরো দু মাস ধরে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে, সকল দলের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। মন্টেগু মিশন কলকাতায় এলেন ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। এখানে একদিন বেলভেডিয়ারে মন্টেগুর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের পুরো দু ঘণ্টা আলাপ হয়েছিল। তখন বাংলার লাট সাহেব ছিলেন লর্ড রোনাল্ডসে। সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়ে চিত্তরঞ্জন মন্টেগুকে যেসব কথা বলেছিলেন [redacted] অনেক সময় তারা অর্থের [illegible] পারেনি। তাঁর মুখের চেহারাই আমি দেখলে [illegible] চিত্তরঞ্জনের মনের [illegible] কথা। মন্টেগু যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রাদেশিক শাসনে বাংলার মন্ত্রী হবেন? — তখন তার উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন: "আমি [illegible] প্রাদেশিক [illegible] দেশের [illegible] মতো নেই।

তারপর লাট সাহেবের সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর কথাবার্তা হয়।

— এই রিফর্ম নিয়ে কাজ করে দেখুন না, মি: দাশ?

— এ রিফর্ম অচল।

— সেটা পরীক্ষা কাজে করলেন না করে কেমন করে বুঝলেন?

— এতো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। সেনা বাহিনী আর বৈদেশিক ছাড়া, বেসামরিক শাসনের আর সব কিছুর নিয়ন্ত্রণের অধিকার পুরোপুরি আমাদের হাতে দিতে হবে।

— সেটা আসবে ধীরে ধীরে।

— আমি চাইছি না আপনার মতো, একমত নই।

এর কিছুকাল পরেই সরকারী ভাবে প্রকাশিত হল মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট। এই রিপোর্টে যে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে সেদিন একমাত্র চিত্তরঞ্জনই অকুণ্ঠভাবে বলতে পেরেছিলেন: "নামে স্বায়ত্তশাসন, ফলে কিছুই নয়। এ জিনিস আমরা চাই না। বরং সেদিন আমাদের বললেন, তোমরা এখনও অনেক পারবে না, তবে এইটুকু নাও। এ অবস্থায় আমরা কি করব? আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকের এ সাহস আছে যে, তারা বলতে পারবে — আমরা এর কিছুই চাই না। তোমাদের দান ফিরিয়ে নাও। এ সংস্কারে আমাদের দরকার নেই। তোমার জিনিস তুমিই ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

দেশকে, দেশের লোককে এই ভাবেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন।

১৯২০

১৯১৮, ১৯ জুলাই।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। ঐদিন প্রকাশিত হয় রৌলাট কমিটির রিপোর্ট। এর মাত্র দশদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট। ছায়া ও কায়ার মধ্যে যতখানি তফাৎ, এই দুটি রিপোর্টের মধ্যে ছিল ঠিক ততখানি তফাৎ। মন্টেগু রিপোর্টে যেটুকু দেওয়া হয়েছিল, রৌলাট রিপোর্টে তা কেড়ে নেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় ভারত-সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ভারত রক্ষা আইন নামে একটি জরুরী অস্থায়ী আইন প্রবর্তিত হয় ও সেই আইনের বলে বহু দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক কর্মীকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়।

যুদ্ধের পর সেই আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বিলাতের পার্লামেন্ট লণ্ডন হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার সিডনি রৌলাটকে চেয়ারম্যান করে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি কমিটি গঠিত হয়। স্যার সিডনী ছাড়া এই কমিটিতে আরো চারজন সদস্য ছিলেন—এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন ভারতীয়। চার মাস পরিশ্রম করে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এরই নাম রৌলাট রিপোর্ট। ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য রৌলাট রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, শুধু জুরী ছাড়াই রাজনৈতিক মামলার বিচার করা চলবে এবং সন্দেহক্রমে যেকোন লোককে বিনাবিচারে ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য অন্তরীণবদ্ধ করার পূর্ণ ক্ষমতা শাসনবিভাগ ও সরকারকে দেওয়া হয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদে ভারত-সরকার দুটো বিল নিয়ে এলেন।

বুঝতে পারল কি ধরনের স্বায়ত্তশাসন ওরা দিতে চলেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সেদিন যে ঝড়ের বেগ দেখা দিয়েছিল তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল রৌলট আইন এবং মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার।

[redacted] এর ঠিক কয়েক মাস আগে, দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে, চিত্তরঞ্জন একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, [redacted] স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর সঙ্গে সরকারের সঙ্গে থেকে সহযোগিতা সম্পর্ক নির্ধারণের কথাও বলা দরকার। দিল্লী কংগ্রেসে তাঁকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এই কংগ্রেসেই চিত্তরঞ্জনের নিয়মতান্ত্রিকতার উত্থান। এর পর মাস পরেই এল রৌলট আইন। শাসকের সদিচ্ছার রূপ দেখা গেল দমননীতির মধ্যে দিয়ে।

এই পটভূমিকায় গান্ধী শুরু করলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

ল্যাংটি-পরা এক [redacted] ফকির পরাধীন দেশকে শেখালেন, মানুষকে নেতৃত্ব দিলেন। এই আন্দোলনের জন্য গান্ধী যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেছিলেন এবং যে প্রতিজ্ঞাপত্রে সত্যাগ্রহীকে স্বাক্ষর দিতে হত, সেটি পাঠ করে চিত্তরঞ্জন গান্ধীর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন। বললেন: 'ইনিই আমাদের মুক্তিআন্দোলনের নেতৃত্ব করার যোগ্য।' [redacted] রৌলট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধী যখন সত্যাগ্রহের আহ্বান জানালেন, চিত্তরঞ্জনের মনে এই আবেদন সাড়া জাগিয়ে তুললো একটা নতুন স্ফূর্তি, নতুন চেতনা। তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। সব ছেড়ে, আন্দোলন করবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি।

৬ই এপ্রিল, রবিবার।

সেদিন কলকাতায় মনুমেন্টের তলায় হল সভার আয়োজন। বিরাট জনসমাবেশ। সারাদিন উপোস করে আছেন চিত্তরঞ্জন। সেই বিরাট সভায় দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা করলেন: 'আজ মহাত্মা করমচাঁদ গান্ধীর দিন আর বাঙালির হৃদয়বেদনা প্রকাশের দিন। তিনি সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছেন যদি কেউ স্বদেশীকে ভালবাস, স্বরাজকে ভালবাস তবে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারবে— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। এই আন্দোলন প্রেমের আন্দোলন, ধর্মের আন্দোলন এ ইংরেজ বিদ্বেষ-প্রসূত নয়। গান্ধীজি বলেছেন, সত্যাগ্রহী যেমন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী। সে মানে আইন সমাজের কল্যাণের জন্য। কিন্তু সে এও জানে যে, কখনো কখনো এমন আইন তৈরি হতে পারে যা ন্যায়সঙ্গত নয় এবং যা অত্যাচারমূলক, অমঙ্গলজনক। তেমন আইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শান্তভাবে দাঁড়ান কর্তব্য। রৌলট আইন তেমনি একটি আইন।'

৬ই এপ্রিল, রবিবার।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হল।

উপবাস, প্রার্থনা, হরতাল ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ—এই ছিল আন্দোলনের চেহারা। জাতির প্রাণে যেন এক উন্মাদনার সৃষ্টি হল। সেই রবিবারে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল — সব জায়গায় প্রতিপালিত হল এই অভূতপূর্ব হরতাল; রাজধানী দিল্লিতে সত্যাগ্রহের সফলতা ছিল বেশি, যদিও সেখানে কিছু গোলমাল হয়েছিল যার ফলে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। কলকাতা, অমৃতসর, বোম্বাই ও আমেদাবাদেও সত্যাগ্রহীদের ওপর গুলি চলে। পাঞ্জাব ও দিল্লীর অবস্থা গান্ধীকে উদ্বিগ্ন করলো।

তিনি বোম্বাই থেকে দিল্লী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফিরিয়ে আনা হয় বোম্বাইতে।

গান্ধী গ্রেপ্তার হয়েছেন — দাবানলের মতো এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। দেশবাসী ক্রোধে ফেটে পড়ল। আন্দোলন চলে গেল হিংসার খাতে। পুলিশের দমননীতি প্রবল হয়। আন্দোলন চূড়ান্ত আকার ধারণ করল পাঞ্জাবে। অমৃতসরে দুজন নেতার গ্রেপ্তারের ফলে সেখানে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তা সারা ভারতকে [redacted] স্তম্ভিত করে দিল। কংগ্রেস থেকে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার জন্য [redacted] কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। নিজের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে, তিনি এই সময়ে অনেকদিন লাহোরে ছিলেন; নিজের পকেট থেকে সবরকম খরচের টাকা খরচ করেছিলেন। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন — এই দুজন নেতা এই সময় এই উপলক্ষে খুব কাছাকাছি এসেছিলেন।

এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশেই, ১৯১৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর প্রবর্তিত হলো নতুন ভারত শাসন আইন। এই পটভূমিকাতেই অমৃতসর কংগ্রেস। সভাপতি — মতিলাল নেহরু। কংগ্রেসের সকল নেতারই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন — শুধু উপস্থিত ছিলেন না মডারেট বা নরমপন্থী নেতারা। নতুন শাসন-সংস্কার মেনে নেওয়া হবে কি হবে না — এই প্রশ্নটি নিয়ে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীর অভিমতের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতের মিল হলো না। তিনি সরাসরি এই শাসন-সংস্কার প্রত্যাখ্যান করার [redacted] কথা বলেছিলেন। (অসহযোগের [illegible])

একটা প্রস্তাব গান্ধী এই কংগ্রেসে রেখেছিলেন ও তাতে স্কুল-কলেজ এবং আদালত ও আইনসভা বর্জনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু কিছুই ঠিক হল না।

১৯২০, ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল।

এর কিছু আগেই (১লা আগস্ট) বোম্বাইতে টিলকের মৃত্যু হয়। কংগ্রেসের চরমপন্থী কন্ঠ যেন ভেঙে পড়ল। মৃত্যুর সময় তাঁর শেষ কথা ছিল: 'স্বরাজ-লাভ না হলে দেশের উন্নতি নেই।' এই টিলকের কণ্ঠেই গর্জনধ্বনি একদিন উঠেছিল: 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার।' এই স্বরাজলাভের জন্যই সংগ্রামে নামলেন গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন। এই বীরযোদ্ধার প্রতি চিত্তরঞ্জন বরাবর বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বাংলাদেশে টিলক খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (এখনকার নাম সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে) কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল। সভাপতি — পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়। এই অধিবেশনের সামনে একটিমাত্র প্রস্তাব ছিল — গান্ধীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব। চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতারা এর বিরুদ্ধে ছিলেন — বিরুদ্ধে ছিলেন সভাপতি লাজপত রায়। সেদিন বাংলার একমাত্র জাতীয়তাবাদী নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (ইনি তখন চার বছর অন্তরীণবদ্ধ থেকে মুক্তিলাভ করেছেন) গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ছিলেন এবং তাঁর অহিংস অসহযোগের বাণী প্রচার করার জন্য নিজে সম্পাদনা 'দি সার্ভেন্ট' নামে নতুন ইংরেজি দৈনিক কাগজ বের করেছিলেন। এর দাম ছিল এক পয়সা। কলকাতায় বিশেষ কংগ্রেসের সময় এই কাগজটি প্রকাশিত হয়েছিল শ্যামসুন্দরের সম্পাদনায়।

কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, দেশ এখনো তৈরি হয় নি। তাই তো গান্ধীকে তিনি বলেছিলেন, 'আর পাঁচটা বছর পরে আন্দোলন আরম্ভ করুন, এই সময়টা দেশকে প্রস্তুত করুন। এর মধ্যে সরকার যদি কিছু না করে তবে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ব।' কিন্তু গান্ধী আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা সত্ত্বেও কলকাতা কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব হলো ও সেইসঙ্গে গৃহীত হয় অহিংস মত বর্জনের কার্যসূচী। তবে ঠিক হলো কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই দুটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

১৯২০। ডিসেম্বর মাস।

নাগপুরে কংগ্রেসের ৩৫তম অধিবেশন বসল।

এই অধিবেশনে চোদ্দ হাজার প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। এই কংগ্রেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই সারা ভারতের দৃষ্টি এর উপর নিবদ্ধ হয়েছিল সেদিন। এখান থেকেই কংগ্রেস তথা ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী-যুগের আরম্ভ হয়। কলকাতা থেকে অনেক দলবল নিয়ে চিত্তরঞ্জন নাগপুর কংগ্রেসে যোগদান করতে গিয়েছিলেন গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে। কিন্তু এখানে হয় বড়ো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। চিত্তরঞ্জনের শিবিরে গেলেন গান্ধী। দুইজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাংলার প্রতিনিধিদের শিবিরে এসে বললেন: 'কাল বিষয়-নির্বাচনী সভায় আমি গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করব।' সবাই আশ্চর্য হয়, এই কথা শুনে।

কংগ্রেসের মঞ্চে থেকে অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করে, চিত্তরঞ্জন দৃপ্ত কণ্ঠে একটি বক্তৃতা করলেন। বললেন: 'পৃথিবীতে যত কিছু শক্তি আছে তার নামে আমি আপনাদের আহ্বান করছি এই প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য — যেন এক মনও এর বিরোধিতা না করেন। স্বাধীন হওয়ার ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা আপনারা যে মনে-প্রাণে অনুভব করেছেন সেইটা পৃথিবীতে সবার ঘোষণা করুন।' তাঁর আবেগময় চিত্ত যখন অসহযোগিতার সারবত্তা অনুভব করল সেই মুহূর্ত থেকে তিনি এর অনুকূলে নিজের সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা নিয়োগ করে দেশবাসীকে এই মত ও পথ গ্রহণ করাতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।

'এক বছরের মধ্যেই আমরা স্বরাজ লাভ করব।'

গান্ধীর এই ঘোষণার পর কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন সমাপ্ত হয়। মুক্তিসংগ্রামের পথে শুরু হয় ভারতের নতুন পদক্ষেপ। জাতীয় মহাসভা ধারণ করল এক নব-কলেবর। জাতি উদ্বুদ্ধ হয় এক নতুন চেতনায়। যা ছিল এতকাল শুধু বুদ্ধিজীবীদের হ্যাট-কোট-প্যান্ট-পরা একটা বিতর্কসভা, সেখানে দেখা যাবে খদ্দর-পরা দেশপ্রেমিকদের। স্থাপিত হওয়ার ছত্রিশ বছর পরে এখন থেকে কংগ্রেস হলো একটি সুগঠিত সংগ্রামী রাজনৈতিক দল। গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন এদেশেই সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একটি মানুষ। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ।

॥ সাত ॥

নাগপুর থেকে ফিরলেন এক নতুন চিত্তরঞ্জন।

অসহযোগী চিত্তরঞ্জন।

সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন।

একদিন প্যারিস থেকে যাঁর কাপড়চোপড় কেচে আসত, যাঁর ভোগ-বিলাস লোকের কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল, সবাই দেখল — সেই মানুষটাই বদলে গেলেন রাতারাতি। আমীর থেকে ফকির, ভোগী থেকে ত্যাগী। ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠার শিখর থেকে চিত্তরঞ্জন নেমে এলেন পথের ধুলোয়। ১৯২১ সালের নববর্ষে কল্লোল প্রত্যক্ষ করল এক নতুন ছবি:

চারদিক দিয়া আসিয়াছিল ভারত-জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী আনিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'!
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষা-ভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখালো ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি, উদিলে নিখিল ছানি —
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী।

এমন ত্যাগ, এমন মহান ত্যাগের ছবি বাঙালি বুঝি আর কখনো দেখেনি। সবাই স্তব্ধ হয়।

নাগপুর থেকে ফিরে এসেই চিত্তরঞ্জন প্রবল উৎসাহে নামলেন কর্মক্ষেত্রে। রসারোডের সেই বাড়ি — যেই জোড়া সিংহের শীর্ষে উড়ল ত্যাগের গৈরিক পতাকা। জাতীয় আন্দোলনের তখন পীঠস্থানে পরিণত হলো চিত্তরঞ্জনের বাসভবন। সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল তাঁর মধ্যে। [illegible] কোটি টাকা দিয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। আইনের ব্যবসায় ছেড়ে তাঁর [illegible]

আয় ছিল ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা। প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর ত্যাগের শেষ ছিলনা। নিজের বলতে কিছুই রাখলেন না তিনি — স্ত্রী-পুত্র, বসতবাড়ি, ভোগবিলাসের সমস্ত উপকরণ — সবই তিনি অকুণ্ঠচিত্তে দেশসেবার যজ্ঞে আহুতি দিলেন। এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসের বিরলতম, এই প্রথম। চিত্তরঞ্জনের এই সর্বত্যাগের দৃষ্টান্ত দেশের বহু লোককে সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রদীপ থেকেই প্রদীপ জ্বলে। চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ দেখে অনেকে এই পথে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন।

space

পাঁচ দফা কর্মসূচী নিয়ে শুরু হয়েছিল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন: ১. সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকরি ছেড়ে দেওয়া; ২. সরকারী দরবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান না করা; ৩. [redacted] সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও কলেজ থেকে ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনা; [redacted] ৪. আদালত বর্জন করা অর্থাৎ আইন-ব্যবসায় থেকে বিরত থাকা ও ৫. আইন সভায় প্রবেশ না করা অর্থাৎ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা। এর মধ্যে তিনটি বিষয়ের উপর বেশি জোর দেওয়া হয় — আদালত, আইন সভা ও স্কুল-কলেজ বর্জন। এই ত্রিসূত্রী কার্যক্রমের ভিত্তিতে আন্দোলনকে ব্যাপক করে তোলা হবে অহিংস উপায়ে — এই ছিল গান্ধীজির মনের কথা।

চিত্তরঞ্জন প্রথমে দৃষ্টি দিলেন ছাত্রদের উপর। তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য নাগপুর থেকে ফিরে এসেই তিনি কলকাতার বিভিন্ন কলেজে, পর পর তিন দিন

তিনিই বক্তৃতা করলেন। প্রত্যেকটি সভায় তিনিই ছিলেন সভাপতি। কালো রঙের কোট গায়ে ও চটি জুতো পায়ে তিনি যখন সভায় আসতেন তখন সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ হতো। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে তিনি যখন বললেন — 'বাংলার ছাত্রসমাজ! তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ আশা, তবে তোমরা নিশ্চেষ্ট কেন?' — তখন সভায় যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল তার তুলনা নেই।

১৯২১, ১৪ই জানুয়ারি। শহরের রাজপথে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। ঐদিন কলকাতার কলেজের ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ঐদিনই মির্জাপুর পার্কে (বর্তমানে নাম শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) বিকেলবেলায় ছাত্রদের এক সমাবেশে চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে ছেলেরা তাঁকে বলল — আমাদের জন্য [redacted] কলেজ করে দিন।

— তোমাদের এখন অনেক কিছু করতে হবে। গ্রামে গ্রামে স্বরাজের বার্তা বহন করে নিয়ে যেতে হবে, পল্লীর জনগণের সেবায় ব্রতী হতে হবে।

— আমাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করতে চায় তাদের কি হবে?

— তোমাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করতে চাও তাদের জন্য আমি ন্যাশনাল স্কুল-কলেজ করে দেব।

চিত্তরঞ্জনের আহ্বানের বন্যা দেখতে দেখতে সর্বাঞ্চলে প্রবাহিত হলো। ইংরেজরা দেখে গেল যে, অল্পদিনের মধ্যে বাংলায় মোট ত্রিশ হাজার স্কুল-কলেজের ছাত্র অসহযোগ করেছিল।

space

১৯২৩, ৯ই জানুয়ারি।

ঐদিনের 'নায়ক' পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় বেরুলো। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল 'দেশবন্ধু'। অদ্ভুত সেই সম্পাদকীয়। যেমনি শ্যামসুন্দরের 'সার্ভেন্ট' কাগজের সমসাময়িক মত গ্রহণ করে, সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে যোগদান করার জন্য চিত্তরঞ্জনকে 'দেশবন্ধু' বলে অভিনন্দিত করা হলো। তখন থেকেই বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণের কাছে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন। তাঁর বিপুল ত্যাগের জন্যই দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি দেশবন্ধুরূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

তাঁর চারদিকে বিপুল কর্মের আবর্ত রচনা করে লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হলেন দেশবন্ধু। ১৯০৫-এ স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলায় যেমন বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। এই সংকল্পকে কার্যকরী করার জন্য তাঁর জীবনের শেষ চার বছর বিশ্রাম কাকে বলে তা দেশবন্ধু জানতেন না। এই আন্দোলনকে সফল করে তুলবার জন্য দেশবন্ধু বাংলার বিপ্লবীদের ডাক দিলেন ও তাঁদের সহযোগিতা চাইলেন। তাঁদের বললেন, 'তোমরা আমার পিছনে না দাঁড়ালে আমি কেমন করে এই আন্দোলন চালাব।' তাঁর আবেদন ব্যর্থ হয়নি। তাঁর ডাকেই বিপ্লবীরা ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন হিসাবেই অসহযোগের সামিল হয়েছিলেন।

বন্যার স্রোতের মতোই দুর্বার বেগে প্রবাহিত হলো অসহযোগ আন্দোলন সারা বাংলায়। সেই স্রোতোধারাকে ভগীরথের মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে

^ অসহযোগ আন্দোলনের সেনাপতি

গিয়েছিলেন, দেশবন্ধু। আগেই বলেছি, দেশবন্ধু প্রথমে আহ্বান জানিয়েছিলেন কলকাতার ছাত্রদের। তাঁর সে আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে প্রায় হাজার ছাত্র সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবাসী, রিপন, সিটি ও বিদ্যাসাগর — এই চারটি প্রবীন বেসরকারী কলেজের ছাত্ররাই তাঁর আহ্বানে প্রথম সাড়া দিয়েছিল। এক বিরাট সভায় দেশবন্ধু তাদের বললেন: 'এক বছর কি দুবছর তোমরা লেখাপড়া স্থগিত রাখতে পারো, কিন্তু স্বরাজ-সংগ্রামে তোমাদের স্বাধীন যোগদান করতে হবে। শুধু কলেজ ছাড়লেই হবে না, গঠনমূলক কাজও করতে হবে তোমাদের। দেশের তরুণরা যদি এইভাবে এগিয়ে আসে তাহলে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে দেশ স্বাধীন হবেই।'

'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন' নামে

এরপর তিনি একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অগ্রসর হলেন। স্কুল খুলতে হলে বাড়ির দরকার। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে ^ [redacted] একটা [redacted] তলা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো মাসিক দুশো টাকা ভাড়ায়। এইখানে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে স্থাপিত হয় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ও জাতীয় মহাবিদ্যালয়। উদ্বোধন করলেন মহাত্মা গান্ধী, সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই দেশবন্ধুর এই মহৎ প্রচেষ্টার অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। এরপর কালীঘাটে আর একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

গেরুয়া

(দেশবন্ধুর আহ্বানে শুধু স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়নি। এটাই হয়ে উঠেছিল স্বরাজ-সাধনার প্রধান কর্মকেন্দ্র — এখানেই যোগ-যাগের, ^ প্রধান পীঠস্থান।

প্রবীণ নেতা চিত্তরঞ্জন আর তাঁর এই কর্মযজ্ঞকে সার্থক করে তুলবার জন্য বাংলার যেসব বিপ্লবী তরুণ-দল সেদিন তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন এক যুবক। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু।

তেজস্বী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী যুবক।

আই.সি.এস. পাস করেই তাঁর মনের পথ বদলে যায়।

মনে করলেন সিভিল সার্ভিসের চাকরীর খাঁচায় না ঢুকে দেশের সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করবেন। সঙ্গে সঙ্গে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন দেশপ্রেমিক যুবক। বিলাতে বসেই দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল তাঁর মন। দেশবন্ধুর ত্যাগ, তাঁর কর্ম-সাধনা, স্বরাজের জন্য দেশকে, জাতিকে জাগাবার জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা জেনে দেশবন্ধুকেই তাঁর গুরু বলে মনে মনে গ্রহণ করলেন। ১৯২১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দেশবন্ধুকে কেমব্রিজ থেকে একখানা চিঠি লিখে ভারতের মুক্তি-যুদ্ধে, স্বাধীনতা-যজ্ঞে নিজেকে নিবেদন করবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহের কথা জানালেন।

ঐ চিঠিখানা পেয়ে দেশবন্ধু অবাক। এযে মহান ত্যাগ! আই.সি.এস. আজ ভারতবর্ষের চাকরীজীবনে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, যাতে আছে প্রভাবের দম্ভ। নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবন — নিশ্চিন্ত আরামের জীবন। সেই আরাম, জীবনের নিশ্চিত ভোগ-সুখ ছেড়ে এক যুবক তাঁদের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করতে চাইছেন — বার বার ভাবতে লাগলেন দেশবন্ধু। বার বার চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। পরদিন বাদে আর একখানা চিঠি এলো সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে। এবার দেশবন্ধু বুঝলেন, দেশের

জন্য, স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত এমনি যুবশক্তি। নিজের হাতেই তিনি গড়ে নিলেন সুভাষচন্দ্রকে। বাংলা তথা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে না পরে আর কখনো ঘটেনি। নেতা পেলেন এমন খাঁটি কর্মীকে, কর্মী পেলেন এক অসাধারণ নেতাকে। এইতো দেশবন্ধু অনেকবার প্রকাশ্যে বলতেন : 'দেশের কাছে আমি কি দিয়েছি জানিনা, কিন্তু দেশের কাছে আমি দিয়েছি সুভাষকে।' আর সুভাষচন্দ্র বলতেন : 'আমি এমন একজন নেতাকে পেয়েছি যাঁকে আমি মনেপ্রাণে অনুসরণ করতে পারি।' দেশে ফিরে এসে এই সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত। তাঁর মানসপুত্র। তাঁর রাজনৈতিক [illegible] প্রধান উত্তরসাধক।

[illegible]

নাগপুর থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধুর প্রধান কাজ ছিল অসহযোগের মন্ত্র প্রচার। ছুটলেন প্রথমে পূর্ব বাংলায়। যোদ্ধা [redacted] সেদিন কলকাতা থেকে শুরু করে। সাথে ছিলেন বাসন্তী দেবী। প্রথম পাঁচ মাস পর্যন্ত চলেছিল এই তাঁর সফর। লক্ষ্য দেশের বিস্তৃতি, পরনে সাধারণ বেশভূষা — দেশবন্ধু ছুটলেন পূর্ববাংলার দিকে। তাঁর আগে আগে চলেছে তাঁর অতুলনীয় নামের খ্যাতি। শহর থেকে গ্রাম, গ্রামের পর গ্রাম, অজস্র জনসমাগম — পূর্ব বাংলার শহরে শহরে উদ্দীপনা জনসাধারণের মধ্যে জাগল। আর আগ্রহ। নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম — এইসব স্থান তিনি পরিভ্রমণ করলেন; সর্বত্র প্রচার করলেন অসহযোগের বাণী। কয়েকটি স্থানে স্থাপিত হল জাতীয় বিদ্যাপীঠ। দিকে দিকে সভা, দিকে দিকে প্রাণ-চাঞ্চল্য। একটা উদ্দাম প্রাণতরঙ্গ যেন সেদিন বয়ে গিয়েছিল পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায়। এই সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখ করি।

১৯২১, ২রা মার্চ।

তারপর কাজ শেষ করে ময়মনসিংহের দিকে যাত্রা করলেন দেশবন্ধু। তিনি আসছেন শুনে ময়মনসিংহের প্রতিটি মানুষ — স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ছাত্র, কেরানী, উকিল মোক্তার সকলেই — উৎসাহে উদ্বেলিত। শহরের লোক ঘর ছেড়ে চললো পথে পথে, জনতার স্রোত শহর ছেড়ে ছুটলো স্টেশনের দিকে। প্ল্যাটফর্মে জনসমুদ্র। বাসন্তী দেবীর সাথে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলেন দেশবন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে উঠল হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনি, বন্দেমাতরম্! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জয়! মাতা বাসন্তীদেবীর জয়!

জনতার এই জয়ধ্বনির মধ্যে দেশবন্ধু যখন প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে ময়মন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সামনে এসে তাঁর হাতে তুলে দেয় ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারার আদেশনামা। তাতে দেশবন্ধুর উদ্দেশে লেখা ছিল: "যেহেতু আপনার আগমনে শহরের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমি ১৪৪ ধারার বলে আপনাকে শহরের মধ্যে ঢুকতে নিষেধ করছি।"

আদেশটি পড়ে দেশবন্ধু একটু ভাবলেন।

তাঁর মন কিছুতেই ঐ আদেশ মানতে রাজী হয় না। তবুও বললেন, "জেলেই যাব, আর কি হবে?"

সবাই বুঝলো তিনি সরকারী আদেশ অমান্য করতে প্রস্তুত। এমন সময় তাঁর দুজন সহকর্মী তাঁকে বোঝালেন, কংগ্রেস তো ১৪৪এর হুকুম অমান্য করতে এখনো আদেশ দেয়নি। কথাটির যুক্তি তিনি বুঝলেন। সন্ধ্যার গাড়িতে ময়মনসিংহ ত্যাগ করবার আগে প্ল্যাটফর্মে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে দেশবন্ধু

বললেন: "আর আমি অনিচ্ছায় এই অন্যায় অংশে অংশ নিলাম। এরপর ঢাকা
জীবনের বিড়ম্বনা। এরপর ঢাকা যেন গতি নেই।" সেদিন প্রায় সব স্বদেশীদের এই
আন্দোলন সর্বত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলার লাটসাহেব রোনাল্ডস্‌ ঢাকায় ছিলেন।
তিনি নিজের চোখে দেখলেন, হতবাক হলেন। কলকাতায়ও ছুটি ঘোষিত
হয়েছিল।

ঝড়ের গতিতে দেশবন্ধু পূর্ববঙ্গে ছুটে চলেছেন।

কুমিল্লা থেকে সোজা চলে গেলেন চট্টগ্রামে। সেখানে তিনি অতিথি হলেন
ব্যারিস্টার জে. এম. সেনগুপ্তের বাড়িতে। ইনিই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। তিন দিন আগের
জন্য আইনব্যবসা ছেড়ে দেশের কাজে যোগদান করেন এবং চট্টগ্রামের প্রথম
নেতা হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে অনেক দেশপ্রেমিক সেদিন দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে-
ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তেমনটি আর কেউ পারেননি। দেশবন্ধুর ডাক এই দেশপ্রেমিক
অধ্যাপককে এমন ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল যে তিনি মুহূর্তের মধ্যে অমন চাকরি
ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে নেমেছিলেন।

১৯২১। এপ্রিল মাস।

বরিশালে প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মিলন হলো। সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল।
এই সম্মিলনীতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে মনোমালিন্য চরমে উঠেছিল। কারণ সভাপতির ভাষণে
তিনি বলেছিলেন যে, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে স্বরাজ হবে না, হতে পারে না।
চিত্তরঞ্জন এই সময় গুরুর উপর খুব অসন্তুষ্ট হলেন। বরিশাল সম্মিলনীতে তিনি প্রকাশ্যে

সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: 'স্বরাজ অর্থাৎ এর স্থান রূপ কল্পনা করা সম্ভব নয়। এ স্বতন্ত্র ও প্রকৃতির শাসনের মতো নয়। স্বরাজ স্বরাজই, এ একেবারে আলাদা। এর কোন বিশিষ্ট নাম নেই। যখন দরকার হবে তখন এর নাম দেব। স্বরাজ আমাদের — হিন্দু ও মুসলমানের জন্মগত অধিকার। এই অধিকারকে পেতে হলে সাধনা চাই। এসময়কার প্রকৃত-পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠাই এক মন্ত্র। অহিংসা আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় পথ। আমার বলার কথা এই যে, স্বরাজ মানে স্বার্থ ত্যাগ, আত্মোৎসর্গ।'

এই সময়ে কংগ্রেস থেকে জারি হয় 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ড'। ঠিক হয় সারা ভারতবর্ষ থেকে তিন মাসের ভিতর কার্যের মধ্যে তুলতে হবে এক কোটি টাকা। ঐ টাকা খরচ করা হবে স্বরাজের কাজে। বাংলা দেশকে তুলে দিতে হবে দশ লাখ টাকা। এই টাকা সংগ্রহের জন্য দেশবন্ধু জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি নতুন করে গঠন করলেন। দলের লোকদের ডেকে বললেন, 'দেখো, যেন বাংলার মুখ থাকে।' নিজেও তখন মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বের হলেন উত্তর বঙ্গ সফরে।

একে একে বগুড়া, মালদহ, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি ভ্রমণ করলেন এবং সর্বত্র তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের জন্য টাকা তুললেন। এক জল-পাইগুড়ি শহরে নগদ ও গয়নায় কুড়ি হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এসময়ে [redacted] কিন্তু জনসাধারণ [redacted] দুটি অত্যাগী দেশবন্ধুর হাতে তাদের যথাসর্বস্ব তুলে আনা পয়সা দান করে। এই অসামান্য দানে তিনি খুশি হলেন এমন অভিভূত

হয়েছিলেন যে, দেশবন্ধু [redacted] ঐ সভার মধ্যেই এক ভিখারী দুহিতাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরেন। আলবার্টহলেও তিনি স্বরাজ্য তহবিলে একটি মেয়ের এক টাকা দান করেছিল। তাতে দেশবন্ধু এমন মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজের গলার মালা খুলে তখনি ঐ মেয়েটির গলায় পরিয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

এইখানেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রকৃত মহত্ত্ব।

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় সফর তখনো বাকী, এমন সময়ে কুমিল্লা থেকে টেলিগ্রাম এলো। তাতে লেখা ছিল : "চাঁদপুরে চা-বাগানের কুলীরা স্ট্রাইক করেছে। আপনার আসা দরকার।" সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কাছ থেকেও একটা টেলিগ্রাম এলো। তাতেও ঐ একই সংবাদ। এই টেলিগ্রাম দুটো পেয়ে দেশবন্ধু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর মন মুহূর্তে ছুটে গেল চাঁদপুরে সেই নির্যাতিত শ্রমিকদের পাশে। তিনি যখন গোয়ালন্দ এসে পৌঁছলেন তখন সেখান থেকে চাঁদপুরে যাওয়ার স্টীমার বন্ধ। কুলীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে স্টীমারের সারেং, কুলী সকলেই কাজ বন্ধ করেছে।

চা-বাগানের শ্রমিকরা অনেক দিন ধরে সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত। এই অত্যাচার তারা এতকাল মুখ বুঁজেই সয়ে এসেছে। কিন্তু তখন ভারতের দিকে দিকে জনজাগরণের দিন, — অসহযোগ আন্দোলনের বন্যা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলেছে। চা-বাগানের কুলীদের কাছে পৌঁছল সেই মন্ত্র। তারা

পেলো নতুন চেতনা, নতুন মন্ত্রে হয় তারা দীক্ষিত। তাঁরা সংকল্প করল, আর ছোট্ট জীবন তারা যাপন করবেনা। দেশে চলে যাবে, দেশে গিয়ে যা হয় করবে, না খেয়ে মরবে সেও ভালো। এই প্রতিজ্ঞায় একদিন হাজার হাজার কুলী নিজেদের জিনিস-পত্র গুছিয়ে রওনা হলো চাঁদপুর। কিন্তু তারা রেলের টিকিট পেলনা। বাধ্য হয়ে তারা স্টেশনের প্লাটফর্মে তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে তাদের ওপর চলে গুর্খা পুলিশের অকথ্য অত্যাচার। চাঁদপুরের মাটি সেদিন কুলীর রক্তে রাঙা হয়েছিল।

এই খবর পেয়েই কলকাতা ছেড়ে ছুটে এলেন দেশবন্ধু। এসে দেখেন স্টীমার বন্ধ। নৌকো ছাড়া চাঁদপুরে যাবার আর কোন পথই খোলা নেই। তখন বর্ষাকাল। পদ্মা মেঘনার বুক কানায় কানায় ভরা। থেকে থেকে ঝড়ও হচ্ছে। সবাই নিষেধ করে দেশবন্ধুকে নৌকো করে চাঁদপুর যেতে। কিন্তু তাঁর বেদনাভরা মন কুলীদের জন্য গভীর ব্যথায় টন টন করছিল। তিনি কি না গিয়ে থাকতে পারেন? চাঁদপুরে পৌঁছে কুলীদের মুখ থেকে সব কথা শুনে দেশবন্ধু কমিশনার কে. সি. দে-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এদের ওপর এমন অত্যাচারের কোন সংগত কারণ থাকতে পারে?"

কমিশনার কোন উত্তর দিতে পারেননি। কুলীদের তিনি বললেন, সরকারের সঙ্গে সম্মানজনক শর্তে মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন ধর্মঘট চালিয়ে যায়। তিলক স্বরাজ্য তহবিল থেকে দেশবন্ধু [redacted] এদের দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। এই চাঁদপুরের ব্যাপারে দেশবন্ধুর দাক্ষিণ্য-

মুক্ত হিলেন যতীন্দ্রমোহন। অল্পদিন পরেই ওই বিপ্লবী সহকর্মীকে সরকার গ্রেপ্তার করেন ও কারাগারে দণ্ডিত করেন।

উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করে দেশবন্ধু ফিরলেন কলকাতায়। ত্রিশে জুনের দেরী নেই, তারই মধ্যে তিলক স্বরাজ্য তহবিলের টাকা দশলাখ তুলে দিতে হবে। এর সব দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর। টাকা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে; কিছু বাকী ছিল। তখন ডাক দিলেন স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভা হলো। অগণিত লোকের সমাবেশ। সেই সময় দেশবন্ধু যখন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বাংলার মুখ রাখবার জন্য, আমি দুই হাত ঝুলি নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি — তখন, বৃষ্টি যেমন ঝরে পড়ে, সেইভাবে টাকা পড়েছিল ঠিক সেদিন।

২৮শে জুলাই। বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস [redacted] কমিটির সভা বসে। দেশবন্ধু সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতেই বিলাতি কাপড় বর্জন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিলিতি কাপড় বর্জন করলে ভারতবাসী সেই অভাব পূরণ করবার জন্য তৎপর হয়ে স্বাবলম্বী হবে। সভায় আরো একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি নিয়ে এসেছিলেন দেশবন্ধু। আগামী শীতকালে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আসবেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যে সব উৎসবাদির আয়োজন হবে ভারতবাসী কংগ্রেসের নির্দেশে তা একেবারে বর্জন করবে। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তবু আরো অনেক সভ্য সংগ্রহের জন্যও একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। এই তিনটি কর্মসূচীকে বাংলায় সফল করবার সংকল্প নিয়ে দেশবন্ধু কলকাতায় ফিরলেন।

—